সূচীপত্র

ভূমিকা

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এখন অবিশ্বাস্য গতিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এগিয়ে চলেছে। একদিকে এর বিস্তার হয়েছে বহুমুখী, অন্যদিকে ঘটেছে মানের উন্নয়ন। অথচ অর্ধ শতাব্দী আগে বিজ্ঞানীরা ছিলেন বড়ই নিঃসঙ্গ। নিজের ছোট্ট রসায়নাগারে তাঁরা একান্তে কাজ করে যেতেন — কেউই তাঁদের তেমন গুরুত্ব দিত না। কীভাবে সেই একক প্রচেষ্টা থেকে গবেষণা এক বৃহৎ সংগঠিত চেহারায় পরিবর্তিত হল তার ইতিহাস কিছু কম চমকপ্রদ নয়। প্রথম যুগে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে গবেষণা আবর্তিত হত – সেই কারণে জে ডি কর্ণেল এর নাম দিয়েছেন রোমান্টিক যুগ। আমাদের দেশে এই যুগ বা পর্যায়ের হিসেব ঠিক নিয়মমাফিক আসেনি। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে যখন সংগঠিত গবেষণা-কর্মের তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্য — সি এস আই আর, আণবিক শক্তি কমিশন ও ডিফেন্স ল্যাবরেটরীগুলির প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একক গবেষণার ঐতিহ্য চলছে। কিন্তু এদিকে সরকারী দৃষ্টিপাতের আগে, তিরিশের দশকেই এলাহাবাদের এক তরুণ বিজ্ঞানী এই স্বপ্ন দেখতে সাহসী হয়েছিলেন। তিনি তখনই এফ. আর. এস. হয়েছেন এবং যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সংস্থাগুলির সঙ্গে পাল্লা দেবার মত এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী হবার যোগ্য এক বিজ্ঞানী সমাজের ছবি তিনি মনে মনে এঁকেছিলেন। এই চিন্তায় তাঁকে উৎসাহিত করেন তাঁর ছোট্ট বিশ্বস্ত গবেষক ছাত্র গোষ্ঠী। এই চিন্তার এক বড় অংশ অধিকাব করেছিল আমাদের দেশের বিশাল নদীগুলির নিয়ন্ত্রণ। তবে ইনি শুধু স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত হননি — তাঁর জাগরণের প্রতিটি মুহূর্ত খরচ করেছেন তথ্য সংগ্রহ, প্রবন্ধ রচনা, পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন ও অন্যদের এ বিষয়ে অবহিত করার কাজে। এই মানুষটির নাম মেঘনাদ সাহা। তাঁর বিজ্ঞানে অবদানের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার অতিরিক্ত অনেক কিছু ছিলেন। আশ্চর্য কর্মক্ষমতা ও উদ্যম ছিল তাঁর স্বভাবগত।

এত অল্প পরিসরে জীবনীর দ্বারা এইরকম এক ব্যক্তির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। এতে বড় জোর তাঁর বিভিন্ন কর্মধারার একটা আভাস ও সেই কর্মকাণ্ডের হোতার চরিত্রের ঝলকমাত্র দেখান যায়। তাঁর জীবন ও চরিত্রের নানা দিক বুঝতে হলে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর প্রয়োজন।

1954 সালের 6 অক্টোবর মেঘনাদ সাহার ষাট বছরের জন্মদিনে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় মেঘনাদ সাহার কর্ম, জীবন ও দর্শন (হিজ লাইফ, ওয়ার্ক অ্যাণ্ড

ফিলসফি)[1] নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । অধ্যাপক সাহা নিজে এই পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেন। এই বই এবং ডি এস কোঠারীর [2] 'মেঘনাদ সাহা' থেকে আমরা তথ্য ও উপাদান এই জীবনীতে ব্যবহার করেছি । তাছাড়া ডি এম বোসের[3] সাহা স্মারক বক্তৃতা, সাহার রচনাবলী [4,5,6] জগজীৎ সিং[7] ও ডি.এম.মিত্রের [8] লেখা সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং সাহা ও ভাবার উপর রবার্ট অ্যাণ্ডারসনের [9] পি. এইচ. ডি. থীসিস থেকেও আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছি।

সাহা পরিবারের সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি আমরা, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই বিশেষ করে প্রসেনজিৎ সাহা, চিত্রা রায়, রামেশ্বর দাস, কাকীমা (লাবণ্য প্রভা সাহা) এবং অজিত কুমার সাহাকে । সাহার বাল্যকালের অনেক তথ্য আমরা পেয়েছি প্রয়াতা রাধারানী সাহা—শ্রদ্ধেয়া মাসীমার কাছ থেকে । তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাদের এই সব তথ্য জানাতে আপত্তি করেননি । নথিপত্রগুলি আমাদের ব্যবহার করতে দিয়ে অজিত কুমার সাহা আমাদের অশেষ উপকার করেছেন । বি. ডি. নাগচৌধুরী এবং শ্রীমতী দীপালি নাগের কাছেও আমরা তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ ।

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

এক

গ্রামের ছেলে

ঢাকা থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে বংশাই নদী দক্ষিণ থেকে এসে একটি গ্রামকে বেষ্টন করে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে । আজ থেকে একশো বছর আগে এই গ্রাম ছিল বলিয়াদীর মুসলমান নবাবদের । জমিদারেরা থাকতেন ঢাকায়, তাঁদের কর্মচারীদের উপর ছিল খাজনা আদায়ের ভার । এঁদের প্রতিপত্তি সত্ত্বেও শ্যাওড়াতলীতে ছিল সাহাদের প্রাধান্য । এঁরা ছিলেন সকলেই দোকানদার বা ব্যবসায়ী । পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরে ছড়ানো ছিটোনো এইরকম আরও গ্রাম ছিল । শ্যাওড়াতলী ছিল অন্য পাঁচটা গ্রামেরই মত । তবে এক বিষয়ে পরে এই গ্রাম বিশিষ্ট হয়ে ওঠে । এখানেই 1893 সালের 6 অক্টোবর মেঘনাদ সাহার জন্ম হয় ।

বর্ষায় নদীর দুকূল ছাপিয়ে জল পৌঁছে যেত সমস্ত মাঠ ও ক্ষেতে । ফলে যাতায়াত হয়ে পড়ত অসম্ভব । প্রত্যেক বাড়ীতে তাই নৌকো থাকত । জল নেমে যাওয়ার সময় মাটি ধুয়ে যেত । এই ভূমিক্ষয় বন্ধ করার জন্য লোকে বাড়ীর চারদিকে খুঁটি কিম্বা গাছ পুঁতে রাখত । কখনও বা টিনের বেড়া দিয়ে বন্যার আক্রমণ থেকে বাড়ীকে সুরক্ষিত করত । গ্রীষ্মকালে এই নদীই শুকিয়ে সরু খালের চেহারা নিত । পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যঞ্চলের এই ছিল সাধারণ রূপ । এইরকমই এক গ্রামে নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করতেন জগন্নাথ সাহা । বলিয়াদী বাজারে একটি ছোট মুদীর দোকান চালিয়ে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হত।

জগন্নাথের দুই ছেলে ও দুই মেয়ের পরে পঞ্চম সন্তানের জন্ম হয় । মেঘনাদের জন্মের রাত ছিল ঝড় আর দুর্যোগের। বৃষ্টি আর বিদ্যুতের ঘনঘটার মধ্যে দমকা হাওয়ায় আঁতুড় ঘরের চাল উড়ে গেল । তখনকার রীতি অনুযায়ী এই ঘরটি হত মূল বাড়ী থেকে একটু দূরে । ঝড় -বৃষ্টির বিরাম নেই দেখে বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য শিশুর ঠাকুমা তার নাম দেন মেঘনাথ । পরে এটি হয়ে যায় মেঘনাদ । রাবণের পুত্রের মত যিনি পরে অনেক লড়াই করেছিলেন । তাঁর উপযুক্ত নাম হয়েছিল এটি ।

শিশু মেঘনাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল । ঐ অঞ্চলের অন্য শিশুদের মত তিনি সাঁতার খুব ভালই শেখেন । বলা হয়, পূর্ববঙ্গের গ্রামের ছেলেরা নাকি হাঁটতে শেখার আগেই সাঁতার শেখে ।

মেঘনাদের বড় ভাই জয়নাথ স্কুলে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেন নি। তারপর থেকে তাঁদের বাবা আর ছেলেদের স্কুলে পাঠাবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নি। এরপর জয়নাথ এক পাট কোম্পানীতে কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে চলে যান। এর পরের ভাইকেও বাবার কাজে সাহায্য করার জন্য মাঝপথেই স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা যা ছিল তাতে উচ্চশিক্ষা তাঁদের পক্ষে একরকম বিলাসিতাই ছিল।

মেঘনাদ সাত বছর বয়সে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। শিক্ষকরা তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শশীভূষণ চক্রবর্তী ও যতীন চক্রবর্তী। এঁরা দেখলেন, ছেলেটি যা পড়ে তা সহজে ভোলে না। সুতরাং এর পড়াশোনা ছাড়া উচিত হবে না। এ ব্যাপারে ছাত্রও ছিল তাঁদের মতই। বই ছিল তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে পড়তে বসে যেত। যদি কোনদিন মা তাকে ডেকে দিতে ভুলে যেতেন, সে মহা কান্না জুড়ে দিত। স্লেট, পেন্সিল অথবা বই দরকার মত পাওয়া না গেলেও মহা অনর্থ হত। তাই এই পড়া-পাগল বালকটির বাড়ীতে ডাকনাম ছিল 'কান্দুনা' অর্থাৎ কাঁদুনে।

বাড়ীতে পড়াশোনার তেমন কদর ছিল না। বালক মেঘনাদের বাবা-মা তার বইয়ে এত মনোযোগ দেখে মোটেই খুশি হলেন না। তাঁদের ইচ্ছা ছিল মেঘনাদ যেন বাবাকে দোকানের কাজে সাহায্য করেন। সপ্তাহে তিনদিন জগন্নাথ সাহা পনেরো বিশ কিলোমিটার পথ ভেঙ্গে অন্য হাটে যেতেন নিজের মাল বিক্রি করতে। তখন এক বগলে বই, মাথায় ছাতা নিয়ে মেঘনাদ খাবার পৌঁছে দিতে দোকানে যেতেন। তবে কেনাবেচায় তাঁর কোন উৎসাহই ছিল না। এ ব্যাপারে পিতা-পুত্র ছিলেন একেবারে বিপরীত। অনেক সময় পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে তিনি বাবার কাছে লাঠির বাড়ি মারও খেয়েছেন।

খুব ছোট থেকেই মেঘনাদকে লড়াই করে নিজের প্রাপ্য আদায় করতে শিখতে হয়েছিল। প্রথম বাধা ছিল স্কুল সম্পর্কে পরিবারের আপত্তি। ইংরিজী আর নানারকম আধুনিক বিষয় শিখে যদি কারবারের কাজে কোন উপকার না হয় তাহলে সে বিদ্যা শেখার দরকার কি? তাছাড়া কাছাকাছি কোন মিডল স্কুলও ছিল না। সবচেয়ে কাছের স্কুল ছিল দশ কিলোমিটার দূরে শিমুলিয়ায়। সেখানে প্রত্যেকদিন আসা-যাওয়া এবং তার সঙ্গে বাড়ীর কাজে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

সুতরাং বয়স দশে পড়ার আগেই মেঘনাদের সামনে এল দ্বিতীয় বাধা। দশ কিলোমিটার পথ তিনি কি করে পাড়ি দেবেন? এবারে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন দাদা জয়নাথ। তাঁর ইচ্ছে ছিল ছোট ভাইয়ের পড়া অব্যাহত থাকুক। তাই তিনি অনন্ত কুমার দাস নামে এক স্থানীয় ডাক্তারের বাড়ী ছোট ভাইয়ের থাকার ব্যবস্থা

করলেন। তাঁরা মেঘনাদকে বিনা পয়সায় থাকতে দিলেন। অবশ্যই মেঘনাদকে নিজের বাসন নিজেই মাজতে হত। তখনকার দিনে জাতপাতের বিচার অনুযায়ী এটা কিছু অপ্রত্যাশিত নয়, যদিও সহৃদয় দাস দম্পতি এই বালকটির প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন। বালক মেঘনাদকে বাড়ীর ফাই ফরমাস খাটতে হত, গরুর পরিচর্যাও করতে হত। যতক্ষণ পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ততক্ষণ মেঘনাদ এসব কিছুই গ্রাহ্য করতেন না।

এক ফোঁটা সময়ও তিনি বাজে খরচ করতেন না। সৌভাগ্যক্রমে স্কুলে শিক্ষকরাও ছিলেন উপযুক্ত গুরু। তাঁদের শিক্ষকতা এই বালককে প্রেরণা দিত, উৎসাহিত করত। অঙ্কের শিক্ষক প্রসন্ন কুমার চক্রবর্তীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অঙ্ক শিক্ষক উপেন বক্সীর মত ইনিও ছাত্রের মধ্যে গণিতের প্রতি ভালবাসার বীজ বপন করেন[10]। উত্তরকালে এই বীজ পল্লবিত মহীরূহের আকার নেয় ও দেশে বিদেশে এই ছাত্রের নাম ছড়িয়ে দেয়।

সপ্তাহের শেষে মেঘনাদ হেঁটে বাড়ী ফিরতেন। হাঁটার অভ্যাস তাঁর চিরজীবনই ছিল। বর্ষাকালে নৌকো বেয়ে তাঁকে এই পথ পার হতে হত। মিডল স্কুল এইভাবে শেষ হল। পরীক্ষায় তিনি জেলায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করলেন। বৃত্তিও পেলেন। বারো বছর বয়সে তিনি ঢাকায় এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। গ্রামের বালক এতদিনে অন্য এক জগতের সংস্পর্শে এল। তার এতদিনের চেনা জগত থেকে তা অনেক আলাদা। শহরের লোকজন, সেখানকার জীবনধারার সঙ্গে এই প্রথম তাঁর পরিচয়। এখানে যে সব ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল তাদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে নাম করেছিলেন। যেমন নিখিলরঞ্জন সেন, সুরেন্দ্র কুমার রায় প্রমুখ।

মিডল স্কুল পরীক্ষায় ঢাকা ডিভিশনে প্রথম হওয়ার জন্য তিনি মাসে চার টাকা বৃত্তি পেতেন। দাদা জয়নাথ দিতেন পাঁচ টাকা। মাসে মাত্র কুড়ি টাকা মাহিনা থেকেও জয়নাথ এই টাকা তাঁর ভাইকে দিতেন। কারণ বাবার সঙ্গতি ছিল না। তাই বড় ভাই হিসেবে জয়নাথের এটা ছিল কর্তব্য। এছাড়া পূর্ববঙ্গ বৈশ্য সমিতি থেকেও মেঘনাদ মাসিক দুটাকা পেতেন। সব মিলিয়ে এই এগারো টাকায় তাঁকে থাকা খাওয়ার খরচ চালাতে হত।

সেই সময়কার একটি হিসাব থেকে জানা যায় পনেরো টাকায় কিভাবে একজন ছাত্রের খরচ চলে যেত। মোটামুটি এক স্বচ্ছল পরিবার থেকে আসা সেই ছাত্রের খরচ ছিল এইরকম[11] : স্কুলের মাইনে তিন টাকা, থাকা ও খাওয়া দশ টাকা, চা ও জলখাবার এক টাকা, অন্যান্য এক টাকা। মেঘনাদ প্রথমে আর্মানীটোলায় এক ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকতেন। পরে তিনি নলগোলায় এক উকিলের বাড়ী চলে যান। গরমের ও পুজোর ছুটিতে বাড়ী আসতেন। তখন গরুবাছুরকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে

যাওয়া, হাট থেকে সওদা আনা, ছোট ভাইদের পড়াশোনা দেখা, বাবাকে সাহায্য করা ইত্যাদি গৃহস্থালীর নানা কাজে তাঁর সময় কাটত । গ্রামের সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সাঁতার কাটা, নৌকা বাওয়া বাদ যেত না । তবু সবার উপরে ছিল তাঁর নিজের পড়াশোনা। সে ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি ।

মেঘনাদ যখন ঢাকায় যান তখন রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়। 1905 সালে লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন । তার ফলে শুরু হয় অভূতপূর্ব জাতীয় আন্দোলন। বিদেশী বস্ত্র পোড়ান, বিদেশী জিনিস বয়কট এবং মোটা স্বদেশী কাপড় পরা তখন থেকেই আরম্ভ হয় । ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কিশোর মেঘনাদ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন । তাঁদের স্কুলে গভর্ণর সার বাম্পফিল্ড ফুলারের আসা নিয়ে ছাত্রেরা বিক্ষোভ দেখায় । এই জন্য পরে তাদের শাস্তি দেওয়া হয় । দোষী বলে যাদের সাব্যস্ত করা হয় মেঘনাদও তাদের মধ্যে ছিলেন । তবে এই ঘটনার অন্য একরকম ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় । এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মেঘনাদ সেদিন খালি পায়ে স্কুলে গিয়েছিলেন ঠিকই তবে তা গভর্ণরকে অসম্মান জানাবার উদ্দশ্যে ঠিক নয় – তাঁর পরার জুতো ছিল না বলে । যাই হোক স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ক্ষমা করেন নি । আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও স্কুল থেকে বিতাড়িত হন । বিতাড়িতদের মধ্যে ছিলেন তাঁর সহপাঠী নিখিলরঞ্জন । মেঘনাদ পড়লেন খুবই বিপদে । কারণ এইসঙ্গে তাঁর স্টাইপেণ্ডও কাটা গেল । তবে কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল নামে এক বেসরকারী স্কুল তাকে বৃত্তি দিয়ে ভর্তি করে নেয়। তিরিশ বছর পরে যখন সাহার নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তখন যে কলেজিয়েট স্কুল তাঁকে বহিষ্কার করেছিল তারাই তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানায় । সেই বিতাড়িত পুরানো ছাত্রের জন্য পরে তাঁরা গর্ব অনুভব করতে বাধ্য হয়েছিলেন ।

স্কুলে তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন অঙ্ক, তবে ইতিহাসও ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। টডের রাজস্থান পড়তে তিনি খুব ভালবাসতেন । রাজপুত ও মারাঠা বীরদের কাহিনী তাঁকে অনুপ্রেরণা দিত । রবীন্দ্রনাথের কথা কাহিনী এই কারণে ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। যেখানেই যুদ্ধ ও বীরত্বের কথা আছে সেইসব বইয়ের আবেদন তাঁর কাছে খুব বেশি রকম ছিল । মাইকেলের মেঘনাদ-বধ কাব্যও ছিল তাঁর প্রিয় বইগুলির অন্যতম ।

যে কোন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর মধ্যে অল্প বয়স থেকেই লক্ষ্য করা যায় । ঢাকা ব্যাপটিস্ট মিশনের বাইবেল ক্লাসে ভর্তি হলেন তিনি । তিনি যে কাজই করতেন তার মধ্যে কোন ফাঁক রাখতেন না । সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপটিস্ট মিশনের পরীক্ষাতে তিনি সমস্ত বাংলার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান পেলেন। ছোটবেলা থেকেই এইভাবে তিনি নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। 1987 সালে তাঁর একটি বক্তৃতার ফলে তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে এক দীর্ঘ

বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েন । পরবর্তী জীবনে তিনি নাস্তিকতার প্রবক্তা হলেও সবরকম ধর্মগ্রন্থ তিনি খুঁটিয়ে পড়েছিলেন । তার একমাত্র কারণ ছিল কৌতুহল ও জানার ইচ্ছা।

এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি পূর্ব বাংলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন । ভাষা ও গণিতে তার স্থান ছিল সর্বোচ্চ । 1909 সালে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে । তখন তিনি নিজের উদ্যোগে অধ্যাপক নগেন্দ্র নাথ সেনের কাছে জার্মান শেখা আরম্ভ করেন । অধ্যাপক সেন তখন রসায়নে ডক্টরেট করে সদ্য ভিয়েনা থেকে ফিরেছেন । সেই যুগে উচ্চতর বিজ্ঞানের ভাষা ছিল জার্মান । আই. এস. সি. পরীক্ষায় সাহা পেলেন তৃতীয় স্থান, তবে গণিত ও রসায়নে তাঁর স্থান ছিল প্রথম । এই মেধাবী ছাত্রটির প্রতি অধ্যক্ষ ডাবলিউ জে অর্চিবণ্ডের দুর্বলতা ছিল । তাই সাহা যখন ঢাকা ছেড়ে কলকাতা পাড়ি দেন তখন তাঁর মনে একটু কষ্টই হয়েছিল। ঢাকা কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই তরুণ মেঘনাদকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। গণিতজ্ঞ কালীপদ বসু ছিলেন এমন একজন । তাছাড়া অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত সাহাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে আগ্রহী করে তোলেন ।

গ্রাম থেকে ঢাকা ও সেখান থেকে কলকাতা মহানগরী এই যাত্রাপথে সাহা অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে দেখলেন । নিত্য নতুন বৈচিত্রের সন্ধান পেতে লাগলেন তিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন শ্যাওড়াতলীর গ্রামের সেই বালক, যার পিতা এক মুদীর দোকান চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করতেন । পরে নদী নিয়ন্ত্রণে যখন তিনি তাঁর বিজ্ঞানবুদ্ধি নিয়োজিত করে অনেক খসড়া তৈরী করেন তখনও তার আড়ালে ছিল সেই গ্রাম্য পটভূমি–সেই বালক যে খালিপায়ে গ্রামের দীর্ঘপথ অতিক্রম করত, বর্ষার সময়ে নৌকো বেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তবে পাড়ি দিতে হত যাকে । জীবনের শেষ সময় অবধি এই গ্রাম সচেতনতা সাহার মধ্যে ছিল । তিনি কোনদিন সঙ্গীত ইত্যাদি সূক্ষ্মকলার আস্বাদনে সক্ষম হন নি, তাঁর পোষাক পরিচ্ছদেও কোনদিন সৌখিনতা দেখা যায় নি । তাঁর এই আপত-গ্রাম্য বহিরঙ্গের জন্য জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতি সহপাঠীরা তাঁকে 'নিখাদ হীরা' নামে ভূষিত করেন । তিনি প্রকৃতই ছিলেন খাঁটি মানুষ। বাইরের পালিশের প্রতি কোনরকম মনোযোগই তাঁর ছিল না ।

কোন কোন হীরার পালিশের প্রয়োজন হয় না । সাহা ছিলেন এ জাতের । খুবই কম বয়সে অর্থ ও যশ লাভ করেও তিনি কিন্তু সেই অখ্যাত গ্রামের বাল্য জীবনের কথা ভুলে যান নি, যখন তাঁকে খালিপায়ে জলকাদা ঠেঙ্গিয়ে স্কুল যেতে হত । পরে যখন তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা জুতো নিয়ে খুঁতখুঁত করত তিনি অবাক হয়ে বলতেন, 'এত অপছন্দের কি আছে ? তোমাদের বয়সে আমি কোনদিন জুতোই পরিনি' । ছোটবেলার সেই অনাড়ম্বর জীবনধারাই তিনি বজায় রেখেছিলেন । তবে ছোটবেলার সব স্মৃতিই কিন্তু সুখের ছিল না । একবার সরস্বতী পুজোর সময় পুরোহিত তাঁকে

অত্যন্ত রুক্ষভাবে পূজাবেদীর উপর থেকে নেমে যেতে বলেন, কারণ তিনি উচ্চবর্ণের ছিলেন না। এই ঘটনা সেই বালকের মনে কিরকম প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। তারপর থেকে মেঘনাদ পূজা পার্বনেব সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন। সরস্বতী কিন্তু তার এই বরপুত্রের উপর অকৃপণ প্রসাদ বিতরণ করেছিলেন। ছোটবেলার এই ঘটনার ভিন্ন আকারে পুনরাবৃত্তি পরেও ঘটেছে। তার ফলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার দাগ কিন্তু কোনদিনই মোছেনি।

জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্রও গ্রামের ছেলে ছিলেন। কিন্তু সাহার ক্ষেত্রে এই পরিবেশ যেভাবে তাঁর মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে তা কিন্তু অপর দুজনের ক্ষেত্রে হয়নি, যদিও তাঁরা গ্রামকে কোনদিনই ভুলে যাননি।

পরিবেশ ছাড়াও নিজেকে গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহা বেশ কযেকজনেব সাহায্য পেয়েছিলেন। সেই দুঃসময়ে এঁরা হাত না বাড়ালে তাঁর জীবনের গতি হয়ত অন্যদিকে মোড় নিত, মেঘনাদ এঁদের উপকারের কথা কোনদিন ভোলেন নি। প্রথম ছিলেন তাঁর দাদা জয়নাথ। মেঘনাদের পড়াশোনা যে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়নি তার মূলে ছিলেন জয়নাথ। শিমুলিয়াতে যে ডাক্তারের বাড়ী থেকে মেঘনাদ পড়াশুনো চালান তাদের পরিবারের প্রতি তিনি সারাজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন ও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ছোটবেলার এইসব পরিচিত ও শুভাকাঙ্খীদের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল সারাজীবন। তাঁর এলাহাবাদ ও কলকাতার বাড়ী তাই সব সময় ছাত্র ও আত্মীয়দের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। তিনি স্ত্রীকে বলতেন, আমি ছোটবেলায় অনেকের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। তখন আমার থাকবার অন্য কোনো জায়গা ছিল না। তাই যে সব ছাত্রদের কোথাও থাকার জায়গা নেই তাদের জন্য আমাদের দরজা সব সময়েই খোলা থাকবে।

সাহার মা সব সময়েই তাঁকে লেখাপড়ার চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। পরীক্ষার ফি দেবার সময় সোনার ঘড়ি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করেন। সাহা মা ভূবনেশ্বরীর নামে শ্যাওড়াতলীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কবেন। বহুদিন অবধি সাহা পরিবারই এই স্কুলটি পরিচালনা করেন। পরে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান সরকার এটি নিজেদের হাতে নিয়ে নেন।

দুই

বাইরের জগত
(1911-1920)

স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান পড়ার জন্য মেঘনাদ 1911 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে সে বছরের আশ্চর্য রত্ন সমাবেশের কথা লিখেছেন–এঁরা ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । সুরেন্দ্রনাথ পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন । প্রশান্ত মহলানবিশ ও নীলরতন ধর এঁদের চেয়ে ওপরের ক্লাসে ছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন এক বছর জুনিয়ব, তবে পবে তাঁর সঙ্গে সাহার খুবই বন্ধুত্ব হয়।

এই ছাত্রেরা অধ্যাপক হিসেবে পেয়েছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। এদেব পদার্থবিদ্যা পড়াতেন জগদীশ চন্দ্রের মত বিজ্ঞানী । রসায়নে প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং ছিলেন । গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ডি এন মল্লিক । জগদীশ চন্দ্র ছাত্রদের থেকে একটু দরত্ব রেখে চলতেন। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাদের বন্ধুর মত । সন্ধ্যাবেলায় তিনি নিয়মিত বেড়াতেন, সঙ্গে নিতেন প্রিয় ছাত্রদের । মেঘনাদ ছিলেন তাদের একজন ।

প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য অনুভব করার অনেক কারণ ছিল। মেঘনাদের মত প্রফুল্লচন্দ্রেরও গ্রামের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল । 1913 সালের দামোদরের বন্যায় প্রফুল্লচন্দ্র ত্রাণের কাজে ছাত্রদের নিযুক্ত করেন । বন্যার প্রলয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে এইভাবে তরুণ মেঘনাদের প্রথম পরিচয় হয় । যদিও পূর্ববঙ্গে নদীর বন্যার চেহারা দেখেই তিনি বড় হয়েছেন তবু এর বিধ্বংসী ক্ষমতার এরকম সর্বগ্রাসী রূপ দেখে তিনি বিশেষভাবে বিচলিত হন । শুধু তাই নয়, একদিক দিয়ে দামোদর তাঁর চোখ খুলে দিল। এই জলের প্রচণ্ড শক্তিকে যদি অন্যভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে তা থেকে মানুষের কত না উপকার হতে পারে । পরবর্তী জীবনে নদী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার এইভাবেই সূত্রপাত হয় । যে সামাজিক দায়িত্ববোধ সাহার সমস্ত জীবন ও কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার দীক্ষা প্রফুল্লচন্দ্রেরই কাছে । আচার্য বলেছিলেন, বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ পারে না ।

পড়াশোনা চলতে লাগল । বি. এস. সি-তে গণিতে অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস

সেকেণ্ড হলেন সাহা । প্রথম স্থান পেলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু । এম.এস সি'তেও এর পুনরাবৃত্তি হল । সত্যেন্দ্রনাথ ও সাহার মধ্যে এইভাবে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব সারাজীবনই ছিল ।

কলকাতায় বেশ কষ্ট করেই চালাতে হত সাহাকে । প্রথমে তিনি ইডেন হিন্দু হস্টেলে ছিলেন । কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকে সেই হস্টেল ছাড়তে হয় । উচ্চবর্ণের ছাত্রদের দুর্ব্যবহার মেঘনাদ সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এমনকি তারা তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতেও অস্বীকার করে । এবকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগেও হয়েছে । হিন্দু গোঁড়ামী বিষয়ে তাঁর বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়ছিল তবে তখন তিনি কোনভাবে তা বাইরে প্রকাশ হতে দেন নি । এর পরে হিন্দু হস্টেলের ছেলেরা যখন তাঁকে সরস্বতী পুজা মণ্ডপে উঠতে বাধা দেয়, তখন তাঁর চেয়েও বেশি আহত হয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা । এর প্রতিবাদে তাঁরা দল বেঁধে হস্টেল ত্যাগ করেন । জ্ঞান ঘোষ ছিলেন এই দলের নেতা। তাঁরা 11Dনং কলেজ স্ট্রিটে একটি বাড়ী ভাড়া করেন । নীলরতন ধর ও ভূপেন ঘোষ এঁদের সঙ্গে যোগ দেন । ঘোষ এবং সাহা দুজনেই তাদের ছোট ভাইদের আনিয়ে নেন। স্টাইপেণ্ড ছাড়াও মেঘনাদ কিছু প্রাইভেট টিউশন করতেন, সেজন্য কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাকে সাইকেল করে আসা যাওয়া করতে হত। তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। এইভাবে তাঁর নিজের ও ছোট ভাই কানাইয়ের খরচ চলত।

এই সময়ে তিনি বাঘা যতীন, পুলিন দাশ প্রভৃতি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। পুলিন দাশকে অবশ্য তিনি ঢাকা থেকেই চিনতেন। মেঘনাদ অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। সদস্যদেব লাঠি ও ছোবা খেলা শেখান হত। খালি হাতে কেবল একটি কুড়ুল দিয়ে বাঘ মারাব ফলে যতীন মুখোপাধ্যায়ের নাম হয়েছিল বাঘা যতীন। পরে বালাসোরের পুলিসেব সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। বাঘা যতীন কলকাতায় এলে সাহাদের কলেজ স্ট্রিটের মেসে উঠতেন ।

সাহার দায়িত্ব ছিল অনেক । পারিবারিক অবস্থার কথা ভেবে তিনি পুরোপুরিভাবে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতে পারেন নি কারণ সংসার চালাবার দায় ছিল । তখনকার দিনে ফিনান্স পরীক্ষা দেওয়া ছিল খুবই সম্মানের । তিনি এই পরীক্ষায় বসার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ থাকার কারণে তিনি অনুমতি পেলেন না। তা না হলে হয়ত তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হত । তিনি হতেন ফিনান্স দপ্তরের একজন সরকারী অফিসার । তা হত সরকারের পক্ষে লাভজনক । কিন্তু বিশ্বের পক্ষে ক্ষতিকর । তবে বলা যায় না, হয়ত সি ভি রামনের মত তিনিও লোভনীয় সরকারী পদেব মায়া ত্যাগ করে নিজের প্রকৃত পথে ফিরে আসতেন শেষ অবধি ।

এম.এস সি শেষ করার পর সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেই কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন । বিভাগীয় প্রধান ছিলেন গণেশ প্রসাদ। তবে অধ্যাপক প্রসাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে স্যার আশুতোষ তাঁদের দুজনকেই পদার্থবিদ্যা বিভাগে নিয়ে আসেন । এতে দুরকম লাভ হল । দুটি তরুণ মেধাবী শিক্ষককে খুশি করা ছাড়াও এদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের অনেক সাহায্য হল । সাহা ও বসু দুজনের মেধা ছিল অঙ্কে, অথচ আশ্চর্যের বিষয় পরে এঁরা দুজনেই পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক কাজ করে সুনাম অর্জন করেন। পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা তাঁরা করেন সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে ।

তাঁদের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ন ছিল না । তাঁদের চরিত্র বুঝতে গেলে তখনকার অবস্থার কথা কল্পনা করতে হবে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এদেশে বিজ্ঞান গবেষণার কোনরকম আবহাওয়া ছিল না। 1876 সালে অবশ্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতীয়দের গবেষণায় উৎসাহী করার জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দা কালটিভেশন অফ সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে এখানে শুধু বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল । পরে গণিতে কিছু গবেষণা হয়। তবে সি ভি রামন এখানে পার্ট টাইম গবেষক হিসেবে যোগদান করার পর সত্যিকার গবেষণা আরম্ভ হয় বলা চলে। 1907 সালে রামনের প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় । এছাড়া প্রেসিডেন্সী কলেজে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন দুই অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র । 1884 থেকে 1900 সালের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ে যুগান্তকারী কাজটি প্রকাশিত হয়। প্রথম মাইক্রোওয়েভ জেনারেটরের ভিত্তি ছিল এই কাজ। প্রায় একই সময় ইতালীয় মার্কনি বেতার তরঙ্গ সম্প্রচার করতে সক্ষম হন। প্রফুল্লচন্দ্রও রসায়নে মৌলিক গবেষণা করে বিজ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এঁরা দুজনেই ইউরোপের নানা বিজ্ঞানসভায় আমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য রায়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক সুযোগ্য গবেষক গোষ্ঠী। পরবর্তীকালে এঁরা রসায়নের পরম্পরা এগিয়ে নিয়ে যান। তবে জগদীশচন্দ্রের সেরকম কোন ছাত্রগোষ্ঠী ছিল না।

এই শতাব্দীর প্রথম দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা হল 1906 সালে উপাচার্য হিসেবে স্যার আশুতোষের নিয়োগ । তখনও অবধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ ছিল পরীক্ষা নেওয়া । স্নাতকোত্তর ক্লাস হত স্কটিশ চার্চ ও প্রেসিডেন্সীর মত দু-একটি কলেজে । আশুতোষ 1914 সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে উপাচার্য ছিলেন । তিনি বুঝতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিভাগ থাকা প্রয়োজন। স্বভাবসিদ্ধ উদ্যমের সঙ্গে তিনি কাজে নেমে পড়েন। বাধাবিপত্তি বিস্তর ছিল। সরকারী অসহযোগিতাও বেশ স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। সৌভাগ্যক্রমে স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের সাহায্য পাওয়াতে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। স্যার তারকনাথ প্রথমে দুটি অধ্যাপক পদের জন্য 13.66 লাখ টাকা দেন। তাছাড়া তিনি

92, আপার সার্কুলার রেডের জমি ও 35, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে জমি সহ বাড়ী দান করেন । প্রফুল্লচন্দ্রকে পালিত অধ্যাপকপদ (রসায়নে) নিতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ছেড়ে আসতে পারলেন না । পরে অবশ্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগ/দেন । সেটা ছিল 1916 সাল । পদার্থবিদ্যায় পালিত অধ্যাপকপদ সি. ভি. রামনকে দেওয়া হয় । রামন তখন ফিনান্স দপ্তরে উচ্চপদস্থ অফিসার । অবসর সময়ে তিনি গবেষণা করতেন । সেই সময়ে সঙ্গীতের ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর কাজগুলি প্রকাশিত হচ্ছে । একটু সময় নিয়ে অবশেষে রামন কাজ ছেড়ে 1917 সালে পালিত অধ্যাপকপদ গ্রহণ করলেন ।

1914 সালে রাসবিহারী ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে 10.46 লক্ষ টাকা দান করেন । এই টাকায় চারটি অধ্যাপক পদ তৈরী হল – ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যা। এই পদে নিযুক্ত হন যথাক্রমে গণেশ প্রসাদ, দেবেন্দ্রমোহন বসু, পি. সি. মিত্র এবং এস পি আঘারকর । এঁরা সকলেই খুব কৃতবিদ্য ও যশস্বী হন । 1919 ও 1921 সালে রাসবিহারী ঘোষ আরও 14 লক্ষ টাকা দেন । তার ফলে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ফলিত রসায়ন নিয়ে টেকনোলজি ফ্যাকাল্টি তৈরী হল । এই সমস্ত অধ্যাপক পদের একটি সর্ত ছিল যে প্রার্থীদের ভারতীয় হতে হবে । এতে বৃটিশ প্রভুরা এত চটে যান যে অনেক বছর অবধি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ছিল।

যাই হোক এইভাবে অর্থানুকূল্য লাভেব পর আশুতোষ 1914 সালেব 27 মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কবেন । অবশ্য ভাবত সরকার থেকে কিছু অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। এর ঠিক চারদিন পরেই তাঁর উপাচার্য হিসাবে কার্যকাল শেষ হয়।

1916 সাল থেকে বিজ্ঞান কলেজ চালু হল । এ বিষযে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন ঃ

> 1916 সালে পুজোব ছুটিব পর আমি বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করিলাম । তীক্ষ্ণদৃষ্টি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেখিলেন, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রত্যেকেই যথাযোগ্য সুযোগ পাইলে বিজ্ঞান জগতে খ্যাতিলাভ কবিবেন । তাঁহাদিগকে নতুন প্রতিষ্ঠানেব সহকারী অধ্যাপক রূপে আহ্বান করা হইল । কিন্তু প্রথমেই একটা গুরুতর বাধা দেখা দিল ।
>
> ঘোষ ও পালিত বৃত্তির শর্ত অনুসাবে আসল টাকা বা মূলধন খরচ করিবাব উপায় ছিল না । শর্তে স্পষ্ট লিখিত ছিল যে লেবরেটরীর ইমারত, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং উহার সংস্কার ও রক্ষা করিবার ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হইবে । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল না । রসায়ন বিভাগে আমি অজৈব বসায়নের ভার লইয়াছিলাম এবং আমার সহকর্মী অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র জৈব রসায়নের ভার লইয়াছিলেন । যে সব যন্ত্রপাতি ছিল, তাহা দিয়াই আমরা কাজ চালাইতাম । কিন্তু ফিজিকাল কেমিষ্ট্রী বা ফিজিক্স

বিভাগে কার্যতঃ কোন যন্ত্রপাতি ছিল না । ওদিকে, ইউরোপে যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া সেখান হইতে কোন যন্ত্রপাতি আমদানি করা অসম্ভব ছিল ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন । পরীক্ষার্থিগণের 'ফি'-এর টাকার উদ্বৃত্ত অংশ গত 25 বৎসর ধরিয়া জমাইয়া একটা ফাণ্ড কবা হইয়াছিল । কিন্তু বিজ্ঞান কলেজের গৃহ নির্মাণ করিতেই তাহা ব্যয় হইয়া গেল । এ যেন তাঁর উপর মাল মসলা ব্যতীত ইট তৈরি করিবার ভার পড়িল । কিন্তু আশুতোষ পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, কাসিমবাজারের মহারাজা স্যাব মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁহার বহরমপুব স্থিত নিজের কলেজে পদার্থ বিদ্যায় 'অনার্স কোর্স' খুলিবার জন্য কতকগুলি মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনিয়াছেন । কিন্তু শেষে ঐ প্রস্তাব পবিত্যক্ত হইযাছে । আশুতোষেব অনুবোধে মহারাজা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যের সহিত সমস্ত যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান কলেজেব জন্য দান করিয়াছিলেন । শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেব অধ্যাপক প্রুলও কিছু যন্ত্রপাতি ধাব দিলেন । আমি নিজে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে 'কনডাক্টিভিটি' যন্ত্র ধাব লইলাম ।

আচার্যদেবের সংগঠিত ছাত্র গোষ্ঠীর কল্যাণে রসায়ন বিভাগ খুব সহজেই চলতে লাগল। যন্ত্রপাতিও কিছু সংগ্রহ হয়েছিল। সেখানে খুব একটা সমস্যা দেখা দেয় নি। জৈব ও অজৈব রসায়ন বিভাগে পঠন-পাঠন ও গবেষণা বেশ ত্বরিৎগতিতে চলতে লাগল তবে সরঞ্জামের অভাবে ভৌত বসাযনে কাজকর্ম কিছুটা ব্যহত হয়েছিল।

বিজ্ঞান কলেজের উত্তর অংশের তিনতলা নিযে পদার্থ বিভাগের কাজ চলতে লাগল। বড বড় হলঘরগুলি দেখে এখনো মনে হয় এগুলি রসায়নের ল্যাবরেটরীর জন্য করা হযেছিল । তবে বসায়নেব তুলনায় পদার্থবিদ্যা বিভাগেব প্রসার খুব দ্রুতলয়ে হয়নি । পালিত অধ্যাপক রামন তখনো যোগ দেন নি । ঘোষ অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন প্রথম মহাযুদ্ধেব জন্য জার্মানীতে আটকে পড়েছেন । বিভাগীয কাজকর্ম সংগঠনের ভার পড়ল নবীন লেকচারারদের উপর । এঁরা ছিলেন শিশির কুমাব মিত্র, ফনীন্দ্র নাথ ঘোষ এবং সুশীল আচার্য । মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বসু পরে ফলিত গণিত বিভাগ থেকে এখানে চলে আসেন । তাঁরা বিভিন্ন কলেজ থেকে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কবলেন, পাঠ্যক্রম ঠিক কবলেন । পড়ানো আরম্ভ হল । কাজ বেশ ভালই চলতে লাগল । যখন রামন এলেন তখন সাংগঠনিক কাজে তাঁর কিছুই কবার ছিল না, বিভাগীয় কাজকর্ম চলছিল স্বচ্ছন্দগতিতে । তবে অধ্যাপক বামন বিজ্ঞান কলেজে এসে কেবল ক্লাস নিতেন । 1932 অবধি তাঁর অধিকাংশ গবেষণাই চলত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে। তিনি অবশ্য কিছু কিছু বক্তৃতা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেও দিতেন । তরুণ লেকচারার বিশেষত মেঘনাদ সাহা সত্যেন বসুর কাছে পদার্থ বিজ্ঞান পডান ছিল একটা চ্যালেঞ্জের মত, কারণ তাঁরা ছিলেন মূলত গণিতের ছাত্র । তবে বেশ সাহসের সঙ্গেই তাঁরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন । স্নাতকোত্তর ক্লাসে সাহার পড়াবার বিষয় ছিল উদস্থিতি

বিদ্যা, পৃথিবীর আকার, বর্ণালী-বিজ্ঞান, তাপগতি বিদ্যা প্রভৃতি । তাপ সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরীটি ছিল তাঁর দায়িত্বে। এই সময়ে তিনি এই বিষয়ের সমসাময়িক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন। প্ল্যাংকের থর্মোডায়নামিক্স ও নার্নস্টের 'দাস ন্যুরে ভারমেসটাজস' পড়েন। পরমাণুর কোয়ান্টাম-বাদের উপর বর ও সোমারফেণ্ডের প্রবন্ধগুলিও পড়েন। কলেজে পড়ার সময় জার্মান ভাষা আয়ত্ত করার ফলে তাঁর খুব সুবিধা হয়েছিল। সহপাঠী ও সতীর্থ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যৌথভাবে সাহা আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। সেটি 1919 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মূল জার্মান থেকে প্রথম ইংরেজী অনুবাদেব কৃতিত্ব সাহা ও বসুর। তাঁদের আগে আর কেউ এটি ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করেন নি।

এস কে মিত্র এবং পি এন ঘোষ ইতিমধ্যে রামনেব অধীনে স্পেকট্রোস্কোপি নিযে গবেষণা আরম্ভ করে দেন। সাহা ও বসু কিন্তু তা করলেন না। কেন করলেন না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। জানা গেছে, প্রথম দিকে রামন সাহাকে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই মর্মে অন্য কারো মাবফত তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। সম্ভবত এই প্রস্তাব সাহার মনোমত হয় নি। তবে তিনি জগদীশচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করলে তাঁর কাছেও গবেষণা কবাব কোন চেষ্টা করেন নি । জগদীশচন্দ্র সেই সময তড়িৎ তরঙ্গ থেকে জীব ও জড়ের জগতেব প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন । পবিশেষ তিনি উদ্ভিদ-জগতেই তাঁব মনোযোগেব কেন্দ্রবিন্দু স্থাপন করেন। তাঁর গবেষণাব ফলাফল বহু প্রবন্ধে প্রকাশিত হয এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে তিনি এক পথিকৃতের সমাদর পান। 1912 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয তাঁকে সাম্মানিক ডি.এস্.সি উপাধি দান কবে। নয বছব পবে বামনও এই সম্মান লাভ কবেন। 1914 সালে জগদীশ চন্দ্র নাইট খেতাবও অর্জন কবেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসব নেবার পব তিনি ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে সেখানে গবেষণা চালিয়ে যাবার অনুমতি পান। তবে তিনি ক্রমশঃ তাঁব বাড়ীতেই গবেষণাগারকে নিযে আসেন। তাঁর বাড়ী ছিল বিজ্ঞান কলেজের ঠিক পাশেই। 1917 সালে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা আজ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য। 1920 সালে জগদীশ চন্দ্র ফেলো অফ দ্য রয়াল সোসাইটি হন।

ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ তাঁদের নিজেদেব পছন্দের ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন, নিজের প্রচেষ্টায় পড়াশোনা কবে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তারই উপ্পর ভিত্তি করে শুরু হয় সাহার গবেষণা। ভাল ল্যবরেটরী ছিল না । থাকার মধ্যে ছিল প্রেসেডেন্সী কলেজের ভাল লাইব্রেরীটি । প্রথম দিকে সাহা নানারকম বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। 1917 সালে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে - বিষয় 'অন ম্যাক্সওয়েলস স্ট্রেসেস ।' এই প্রবন্ধে তিনি অধ্যাপক ডি এন

মল্লিকের সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন । অধ্যাপক মল্লিক ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের, তাঁর অধ্যাপক । তার পব একের পর এক গবেষণা পত্র প্রকাশিত হতে থাকে —'ফেব্রিপেরো ইন্টারফেরোমিটাবে ব্যতিচার মাপার সীমা' (ফিজিকাল রিভিউ 1917), 'স্থিতি-স্থাপকতা বিষয়ে একটি নূতন উপপাদ্য' (জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, 1918), এস চক্রবর্তীব সঙ্গে যুগ্মভাবে 'আলোব চাপ' (জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, 1918), 'ইলেকট্রনেব গতিবিদ্যা' (ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন, 1918), সত্যেন্দ্রনাথ বসুব সঙ্গে যুগ্মভাবে 'একটি নূতন অবস্থা সমীকবণ' (ফিজিকাল রিভিউ, 1919), 'বিকিবণের চাপ ও কোয়ান্টাম বাদ' (এস্ট্রোফিজিকাল জার্নাল, 1919), 'বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার মৌলিক সূত্র' (ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন, 1919)। কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত এই সব গবেষণাপত্রগুলির সবই প্রচুর তত্ত্বীয় পরীক্ষার ফল। একমাত্র ব্যতিক্রম আলোকের চাপ বিষয়ে কাজটি । এতে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি পদার্থবিদ্যা বিভাগের ল্যাবরেটরীতেই তৈরী করা এবং এগুলির সাহায্যে আলোকের চাপ নির্ণয় করা হয় । অঙ্কের ভিত্তিতে যা অনুমান করা হয এই ফলাফল প্রায় তার কাছাকাছি আসে। তখনকার দিনে যখন কোনরকম সাহায্যের উপায় ছিল না, তখন সাহা ও তাঁব সহকর্মীরা যে কি কবে এই অসম্ভব সম্ভব করেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তবে সাহার অভিধানে অসম্ভব বলে কোন কথা ছিল না। কেবলমাত্র এই গবেষণাপত্রে তিনি এই কাজে আগ্রহ প্রকাশ কবার জন্য সি ভি রামনকে ধন্যবাদ দেন। অন্য পেপারে তিনি ছাত্র ও সহকর্মীদের, বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দেন।

এই গবেষণাব উপর সাহা তাঁর ডি.এস.সি থিসিস প্রস্তুত কবেন। এটি দাখিল কবা হয 1918 সালে এবং পবের বছব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী পান। প্রসঙ্গত তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষও সেই বছরেই ডি.এস.সি পান। জ্ঞান ঘোষ ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র। তবে ভৌত রসায়ন বিভাগে তাঁরও ছিল অনেকটা সাহার মত সহায় সম্বলহীন অবস্থা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যিনি প্রথম ডি. এস সি পান তাঁর নাম রসিক লাল দত্ত। 1916 সালে তিনি ডিগ্রী পান রসায়নে। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি 1919 থেকে 1922 অবধি ফলিত গণিতে ঘোষ অধ্যাপক ছিলেন। পরে ইনি আবহাওয়া দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদ নিয়ে চলে যান। শিশির কুমার মিত্র ডক্টরেট পান 1920 সালে।

শোনা যায়, মেঘনাদের থিসিস দেখে স্যার আশুতোষ এটি বিদেশে পাঠাবার প্রস্তাব করেন। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই সাহার থিসিসটি খুব খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেন তিন বিদেশী বিজ্ঞানী—অধ্যাপক ও ডবলিউ রিচার্ডসান, ডঃ পোর্টার ও ডঃ এন আর ক্যাম্পবেল।

সাহা এই সময় প্রচুর কাজ করেছিলেন এবং স্বীকৃতিও পেয়েছেন। 'অন দ্য হার্ভার্ড ক্লাসিফিকেশন অফ স্টেলার স্পেকট্রা' এই বিষয়ে তাঁর গবেষণার জন্য 1919 সালে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরের বছর 'অরিজিন অফ লাইনস ইন স্টেলার স্পেকট্রা' এই বিষয়ে তিনি গ্রীফিথ পুরস্কার পান। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র মোহন বসু লিখেছেন[13]ঃ

> গ্রীফিথ পুরস্কারের জন্য প্রার্থীকে একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হত। 1920 সালে এই পুরস্কারের পরীক্ষক হিসেবে আমার কাছে যে সব রচনাপত্র আসে তার মধ্যে ছিল অরিজিন অফ লাইন্স ইন এ স্টেলার স্পেকট্রা বিষয়ে একটি লেখা। লেখকের নাম হেলিওফিলাস। অন্যগুলির চেয়ে এটি এত ভাল যে একে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করতে দুবার ভাবতে হয় নি।

1918 সালের 16ই জুন মেঘনাদের বিবাহ হয়। পাত্রী রাধারানী রায় ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সাব ডিভিশনের রেকাবগঞ্জের এক সম্পন্ন পরিবারের। তাঁর পিতার বরিশালে ব্যবসা ছিল। সেখান থেকেই তাঁর পূর্বপুরুষরা নারায়ণগঞ্জে আসেন। অল্পবয়সে রাধারানীর মাতৃবিয়োগ হয়। পিতামহী তাঁকে মানুষ করেন। পাত্রের পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল নয় বলে এই বিবাহে পিতামহীর প্রবল আপত্তি ছিল। কন্যার পিতা কিন্তু একজন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ জামাতা লাভ করার আনন্দে সেই আপত্তি গ্রাহ্য করেন নি। শোনা যায় বৃদ্ধা তাঁব পুত্রকে বলেন, এর চেয়ে মেয়েকে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন? পরে সাহা তাঁর এলাহাবাদের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে যান, মথুরা, বৃন্দাবন প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়ে জিজ্ঞেস করেন, নাতনীর অবস্থা দেখে তাঁর কি মনে হয়? এটা কি পদ্মায় ডুবিয়ে দেবার চেয়ে ভাল? তিনি উত্তর দেন, আমার রাধা পয়মন্ত। তাঁর ভাগ্যেই এই সব হয়েছে।

যে বিষয়ে নিজেই পড়াশোনা আরম্ভ করেছিলেন 1919 সাল নাগাদ সাহা সেই বিষয়টি আয়ত্ত করলেন। 1920 সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে তিনি ফিলসফিকাল ম্যাগাজিনে নিম্নলিখিত চারটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠান 1. আইওনাইজেশন অফ দ্য সোলার ক্রোমোস্ফিয়ার (4 মার্চ, 1920) 2. অন এলিমেণ্টস ইন দ্য সান (22 মে, 1920) 3. অন দ্য হার্ভার্ড ক্লাসিফিকেশন অফ স্টারস (মে, 1920) 4. অন দ্য প্রবলেম অফ টেম্পারেচর—রেডিয়েশন অফ গ্যাসেস (25 মে, 1920)

পরের বছর ভূমিকাসহ এই প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত সার জার্নাল অফ দা ইণ্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়। সারা দেশে তাপ আয়নন তত্ত্ব বিষয়ে এইভাবে তাঁর মতবাদ প্রচারিত হয়। তার ফলে জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত প্রসারিত হল।

তিন

বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি
(1920-1922)

সাহার তাপ আয়নন তত্ত্ব ভারতীয় বিজ্ঞানে এক মস্ত অবদান তো বটেই, তা ছাড়া জ্যোতিপর্দার্থ বিদ্যায় এই তত্ত্ব এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ করল। বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের এই শাখায় প্রগতি বন্ধ হয়েছিল।

জার্মানিব মিউনিখ সহরে এক সামান্য চশমাওয়ালা ফ্রাউন হোফার (1787-1826) প্রিজমেব মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলোর বর্ণ বিশ্লেষণ করছিলেন, ঠিক যেমনভাবে নিউটন করেছিলেন। সেটা 1814 খ্রীষ্টাব্দে। তিনি দেখে অবাক হলেন যে বর্ণছত্রের বিভিন্ন বঙের পটির মধ্যে অসংখ্য কালো কালো রেখা। তিনি প্রায় ছশো লাইন দেখেন। এর মধ্যে যে সব রেখাগুলি বিশিষ্ট তাদেব তিনি ইংরেজী বর্ণ মালাব অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করেন। বর্ণছত্রের লাল সীমা থেকে শুরু করে A, B, C, D1, D2, E, b1, b2, F, G1, G2, g, h, H, K, H1 —পর্যন্ত এই রেখার রহস্য বহুদিন জানা যায়নি। এই রহস্যের সমাধান করেন গুস্তাভ রবার্ট ফির্শফ (1824-1887), পয়তাল্লিশ বছর পর। দেখা গেছে যে, কোন কঠিন বস্তু গরম কবতে থাকলে তার থেকে আলো বেরোয়। লোহাকে যথেষ্ট পবিমাণ গবম করলে সাদা আলো বেরোয। এই উত্তপ্ত লোহা বা কার্বন থার্ক'এব বর্ণালীতে বঙেব পাট দেখা যায়। আবার মৌলগ্যাস গুলি থেকে পাওয়া যায় বর্ণালী রেখা। বর্ণালী রেখাগুলির অবস্থান থেকেই মৌল চিহ্নিত হয়। যেমন হাইড্রোজেন ক্ষরণ থেকে পাওয়া যায় প্রধানত H2 (4227Å), HB (4861.37Å) লাইন - এ দুটি ফ্রাউনহোফের চিহ্নিত C এবং F রেখাব সঙ্গে মেলে। উত্তপ্ত ক্যালসিয়ামে ফ্রাউনহোফারেব g রেখা (4227 Å) অতি উজ্জ্বল আর H এবং K রেখা অতি ক্ষীণ দেখা যায়। ফির্শফ বুঝিয়ে দিলেন যে সৌর বর্ণালীতে কালো রেখাগুলি আসলে শোষণ বর্ণালী। জ্বলন্ত সৌরদেহের আলো যখন সৌর আবহমণ্ডলে অপেক্ষাকৃত কম গরম গ্যাস ও বাষ্পের মধ্যে দিয়ে আসে তখন উজ্জ্বল পটি বর্ণালীর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেখাগুলি শোষণের ফলে বর্ণালীতে কালো রেখার উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে শোষণের জন্যও কয়েকটি কালো রেখার কারণ।

ফির্শফের আবিষ্কার জ্যোতির্পদার্থবিদদের এক নতুন পথের সন্ধান দিল। তাঁরা সূর্য এবং অন্য সব তারা থেকে আসা বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে বসে গেলেন কারণ,

এর মধ্যে তারাদেহের ভৌত ধর্ম ও উপাদানের খবর লুকিয়ে আছে। এইভাবে অনেক খবর ও তথ্য জোগাড় হল। কিন্তু সেই তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়েই বিভ্রান্তি দেখা দিল। সৌর বর্ণালীতে রোলাণ্ড 3000 থেকে 7800 অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে যে 20,000 রেখা চিহ্নিত করেছিলেন তার মধ্যে মাত্র 6000 রেখা পরিচিত ছাত্রিশটি মৌলের বর্ণালী রেখার সঙ্গে মেলে। পৃথিবীতে আছে 72 টি মৌল। সৌর দেহেও তাই থাকবে এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

অবস্থাটা আরও গোলমেলে লাগল অন্য তারা থেকে আসা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণে। হলুদ তারাগুলির বর্ণালী সূর্যের বর্ণালীর অনুরূপ। সাদা তারাগুলিতে ধাতব রেখার পরিবর্তে হাইড্রোজেন রেখার আধিক্য দেখা যায়। নীলাভ তারাগুলিতে অসংখ্য অজানা রেখা।

সূর্যের আবহমণ্ডলের বহির্ভাগে বর্ণসমুদ্র (ক্রোমোস্ফিয়ার) থেকে যে উজ্জ্বল লাল রঙের শিখা প্রতিনিয়ত বহুদূর পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে সেই সৌর-জ্বালার (প্রমিনেন্স) দিকে জ্যোতির্বিদদের মনোযোগ প্রথম আকৃষ্ট হয়। কারণ সূর্য গ্রহণের সময় অনেকক্ষণ ধরে সৌরজ্বালা দেখা যায়। 1868 সালে সূর্যগ্রহণের সময় অনুসন্ধান চালানোর জন্যে ফরাসী, ইংরেজ ও মার্কিন বিজ্ঞানীর ভিন্ন ভিন্ন দলে ভারতে এসেছিলেন। সমসাময়িক কালে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ইংরেজ জ্যোতির্বিদ স্যার নরমান লকইয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ও গবেষণার ধারা প্রভাবিত করেছিলেন। সূর্যগ্রহণ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, তাই লকইয়ার এমন এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যার সাহায্যে যে কোন সময়ে সৌরজ্বালার বর্ণালী নেওয়া সম্ভব হয়। এই গবেষণার ফলে তিনি D1 ও D2 বর্ণালী রেখা কাছাকাছি আব একটি নতুন হলুদ রেখা পান। তিনি এটিকে একটি নতুন মৌল বলে চিহ্নিত করেন এবং এর নাম দেন হিলিয়ম। প্রায় একই সময়ে ফরাসী জ্যোতির্বিদ জ্যাসেও একই আবিষ্কার করেন । এর তিরিশ বছর পরে নরওয়েতে এক বিশেষ ধরনের খনিজে হিলিয়ম গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসকালে বর্ণসমুদ্রের বর্ণালীর ছবি প্রথম দেখেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ইয়ং, 1871 সালে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের আবহমণ্ডলের অবস্থা আরও অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করল। ঐ সময় আলোকমণ্ডলের (ফটোস্ফিয়ার) সাতরঙা পটি বর্ণালী অদৃশ্য হয়ে ফ্রাউনহোফারের কৃষ্ণ রেখাগুলির বদলে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল রঙীন রেখা। ইয়ং এর নাম দেন ফ্লাশ স্পেকট্রাম। তার ফ্লাশ স্পের্কট্রামের প্রথম ফটোগ্রাফ তোলেন বিখ্যাত মেরু অভিযাত্রী স্যাকলটন 1896 সালে। এর দু বছর পরে 1898 সালে সূর্যগ্রহণের সময় ফ্লাশ স্পেকট্রাম বিষয়ে গবেষণার জন্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের তিনটি দল ভারতে আসেন। এই দলগুলির নেতা হিসেবে আসেন লকইয়ার, এভারসেড ও লিগাম-ভেলা। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় অতি

অল্প গ্রহণ যেখান থেকে দেখা যায় সেখানে ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা ইত্যাদি কারণে ফ্লাশ স্পেকট্রামে তোলা ফটোগ্রাফে খুব বেশি সংখ্যক রেখা পাওয়া যায়নি। ভারতে এভারসেড 1500টি রেখা পান। উন্নত যন্ত্র ব্যবহার করে 1905 সালে মার্কিন বিজ্ঞানী মিচেল 2500টি রেখার ফটো তোলেন। এই গবেষণার ফলে প্রমাণ হয় যে ফ্লাশ বর্ণালী ফ্রাউনহোফার বর্ণালীর বিপরীত। ফ্রাউন হোফার বর্ণালীর প্রায় প্রতিটি কালো রেখার পরিবর্তে ফ্লাশ বর্ণালীতে উজ্জ্বল রেখা আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমের সংখ্যাও কম নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ফ্রাউনহোফার বর্ণালীতে হিলিয়মের কোন রেখা নেই। অথচ ফ্লাশ বর্ণালীতে হিলিয়মের 20টি রেখা বর্তমান। হাইড্রোজেন রেখাদের ক্ষেত্রে ও এই ধরনের গরমিল দেখা গেল।

সূর্যের আলোক-মণ্ডল, সৌর কিরীট ও বর্ণসমুদ্রের এবং অন্যান্য তারা দেহের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এবং গবেষণাগারে বিভিন্ন মৌলদের বর্ণালীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে এই পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। লকইয়ার ব্যাখ্যা করলেন একই মৌল একাধিক অবস্থায় থাকতে পারে। সৌর আবহমণ্ডলের গবেষণা বিভ্রান্তিকে আরও বাড়িয়ে দিল। ফাউনহোফারের H এবং K রেখা ক্যালসিয়মের রেখা বলে সনাক্ত করা গেছে। কিন্তু মুস্কিল হল এই রেখা দুটি সব থেকে প্রবল সৌর আবহমণ্ডলের অনেক ঊর্ধ্বে সূর্যদেহ থেকে 14000 কিলোমিটার উচ্চতায়। হাইড্রোজেন কিন্তু 8000 কিলোমিটারের উচ্চতায় পাওয়া যায় না। এটি একটি অনবদ্য ধাঁধা। শুধুমাত্র মহাকর্ষ বলই কার্যকরী হলে সূর্যের টান হাইড্রোজেনের তুলনায় ক্যালসিয়মে 40 গুণ বেশি হওয়ার কথা। সৌর আবহমণ্ডলে সব থেকে ওপরে থাকার কথা হাইড্রোজেন তাবপর পারমাণবিক ভর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মৌলগুলি থাকবে — এটাই তো স্বাভাবিক। অবশ্য সূর্যের ভরের কথা বিচার কবলে সূর্যেব কোন আবহমণ্ডলই থাকার কথা নয়।

এই সব তথ্যের ভিত্তিতে নানা ধরনের দূরকল্পী তত্ত্বের উদ্ভাবন হল অতিরঞ্জিত (এনহান্সড) বেখা, মৌলদের প্রোটো-অবস্থা যেমন প্রোটো-হাইড্রোজেন, প্রোটো-ক্যালসিয়ম। একটি নতুন মৌলের নাম দেওয়া হল করোনিয়ম। লকইযার এক অজৈব ক্রমবিবর্তনের প্রকল্প উপস্থাপিত করলেন। এর কোনটা বিজ্ঞানী মহলে গ্রহণীয় বলে মনে হল না, ফলে জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান এক রুদ্ধ দ্বারের সন্মুখীন হল। কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোন প্রগতি হচ্ছিল না। এই রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হল যখন মেঘনাদ সাহা তার তাপ আয়নন তত্ত্ব প্রকাশ করে জ্যোতির্পদার্থ বিদ্যায় এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা করলেন।

গত শতাব্দীর শেষ তিরিশ বছর ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছর ধরে যখন বর্ণালী বিষয়ে তথ্য জোগাড় হচ্ছিল, সেই সময়ে ভৌত বিজ্ঞানের সনাতনী ধ্যান ধারণায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পরিবর্তনের প্রথম ধাপ বলা যায় জে জে

থমসনের ইলেকট্রন আবিষ্কার 1896 সালে। এর পরেই 1900 খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তার কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রকাশ করেন। 1905 সালে নার্নস্ট তার বিষয়ে উপপাদ্য সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেন। পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়সের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন রাদার ফোর্ড 1911 সালে। এর পরই আসে 1916 সালে বর্ণালীর উৎপত্তি বিষয়ে নীলস বোরের থিওরি। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতির্পদার্থ বিদ্যায় মেঘনাদ সাহা অতি বাল্য বয়স থেকেই উৎসাহী ছিলেন। সূর্য ও তারা বিষয়ে অ্যাগনেস ক্লারকের বইটি ওঁর পড়া ছিল। এই বিষয়ে হতবুদ্ধিকারী ধাঁধাগুলিই তাকে এই বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহিত করে। এই গবেষণার প্রথম ফল 'সিলেক্টিভ রেডিয়েশ প্রেসার' নামক প্রবন্ধটি। বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিকিরণ জনিত চাপ সৃষ্টি এবং সৌর আবহমণ্ডলে মৌলদের অবস্থান সম্পর্কে এই চাপের ভূমিকা নিয়ে তাতে আলোচনা করেন।

1916 থেকে 1919 পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যাপনার সময় তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণার বিষয়ে খোঁজ রাখতেন। আগেই বলা হয়েছে যে তিনি নীলস বোর ও আর্ণেষ্ট সমারফিল্ডের পরমাণুর কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা পত্রগুলি পড়েছিলেন। ঐ সময় তিনি এম.এস.সি ছাত্রদের তাপ গতি বিদ্যা পড়াতেন। নিজ অভ্যাস অনুযায়ী ঐ বিষয়ে যত বই আছে সব পড়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্ল্যাঙ্কের থার্মোডাইনামিকস এবং নার্নস্টের ডাস নোয়ায়ে ভার্সে সাৎজ। জ্যোতি পদার্থবিদ্যার তথ্যের ভাণ্ডার তিনি তত্ত্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন।

সাহা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সূর্যে এবং তারায় যা কিছু ঘটছে সবই তার প্রচণ্ড তাপমাত্রার জন্য। এত উচ্চ তাপমাত্রা পৃথিবীতে দেখা যায় না বা গবেষণাগারে সৃষ্টি করা যায় না। সাধারণত তাপগতিবিদ্যা প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন ভৌতিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য — যেমন তরলীকরণ বা বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রে অথবা অণুর বিয়োজনে পরমাণু হওয়ার মত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে। কোন কঠিন বস্তু তার গলনাংকের থেকে বেশি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সেটি তরল হয়। স্ফুটনাংকের বেশি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তা গ্যাসে পরিণত হয়। তাপমাত্রা আরও অনেক বাড়িয়ে চললে কি হবে?

বোর মডেলে পরমাণু কেন্দ্রে আছে পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়স। তার চারপাশে বিভিন্ন কোয়ান্টাম স্তরে ঘুরছে ইলেকট্রনের ঝাঁক। উচ্চ তাপ থেকে শক্তি ঐ ইলেকট্রনে সঞ্চারিত হবে এবং শক্তির মাত্রা যথেষ্ট হলে একটি বা দুটি ইলেকট্রন কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে এসে সৃষ্টি করবে পজিটিভ আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রন। প্রশমিত পরমাণুর আয়ন ও ইলেকট্রনে বিয়োজনকে বলা হয় আয়নন। ইলেকট্রনকে পরমাণু স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে যে শক্তি লাগে তাকে বলা হয় আয়নন বিভব

(আইওনাইজেশন পোটেনসিয়াল)। তাপশক্তি জনিত আয়ননকে বলা যায় তাপ আয়নন।

উদাহরণ হিসেবে ক্যালসিয়ম পরমাণু নেওয়া যাক। ক্যালসিয়ম পরমাণুতে আয়নন ভৌতরসায়নের নিয়মে দাঁড়াবে

$$Ca = Ca^{+} + e\text{-}U$$
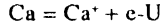
এখানে Ca প্রশমিত ক্যালসিয়ম পরমাণু (গ্যাসীয অবস্থায়), Ca^{+} একটি ইলেকট্রন বিহীন পরমানু, e ইলেকট্রন এবং u এক গ্রাম অণুতে এই প্রক্রিয়ায় নির্গত শক্তি।

যখনই কোন যৌগ অণু (যেমন NH_4Cl) তাপের প্রভাবে একটি বিশেষ তাপমাত্রায় বিয়োজিত হয় (NH_3 HCL) তখন তাপমাত্রা ও চাপ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অণু বিয়োজিত হবে এবং বাকিটা অবিয়োজিত থাকবে। রসায়নে এ সূত্র অনেক দিনই জানা। যদি বিক্রিয়াজনিত তাপ, আপেক্ষিক তাপ এবং বস্তুগুলির বাষ্পচাপ জানা থাকে তাহলে তাপ ও চাপেব হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে বিয়োজনের হ্রাস বৃদ্ধি হিসেব করে বার করা যায। ভৌত রসায়নেব সমীকরণগুলি কিছুটা পরিবর্তন করে যে তারাদেহের বস্তুর আয়নন বিভব হিসেব করতে ব্যবহাব কবা যায় ঐ ধারণা নার্নস্টেব ছাত্র এগার্টের মাথাতে এসেছিল। এগার্টেব উদ্দেশ্য ছিল সীমিত। তাবার অভ্যন্তরে আযনন হতে পারে — এডিংটনের এই প্রকল্পটি যাচাই কবাই ছিল এগার্টেব উদ্দেশ্য। এই পেপারটি পড়েই সাহা দেখতে পেলেন এর বিরাট ভবিষ্যতেব সম্ভাবনা। তিনি তৎক্ষণাৎ বসে গেলেন বর্ণালীর তথ্য এবং আযনন বিভব সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আযনন শক্তিব সঠিক মান নির্ণযে। তাব সঙ্গে প্রযোগ করলেন তাপগতি বিদ্যা ও রসাযনিক ধ্রুবক বিষযেব বিজ্ঞান প্রযোগ কবে সেই সমীকবণে পৌছলেন যাব জন্য তাব খ্যাতি।

$$\log \frac{x}{1-x^2} P = (-) \frac{U}{2.3\,RT} (-) \frac{5}{2} \log T (-) 6\,5$$

এখানে P সম্পূর্ণ চাপ, X সমগ্র অণুব যে ভগ্নাংশ আযনিত হচ্ছে, U আযনন জনিত তাপ, R সার্বিক গ্যাস ধ্রুবক এবং 1 কেলভিন এককে তাপ মাত্রা। বসাযনে U এব মান নির্ধারণ করা হয় ক্যালেরোমিতির পবীক্ষা থেকে। বর্তমান প্রযোগে এটা নির্ধারণ করা হল বর্ণালী বিশ্লেষণে আয়নন বিভবে নির্ধারিত মান থেকে। "আয়োনাইজেশন অফ দি সোলার ক্রোমস্ফিযাব" শীর্ষক গবেষণা পত্রে এই সমীকরণটির প্রমাণ এমন সরল, সহজ ও অনাযাস ভঙ্গীতে করা হয়েছে যে আশর্চ্য লাগে এতদিন কেন অন্য কেউ করেন নি। এই সমীকরণটির সাহায্যে সাহা দেখালেন বর্ণ সমুদ্রের উচ্চস্তরে আছে প্রধানত আয়নিত অবস্থায় ক্যালসিয়ম, বেরিয়ম, স্টন্সিয়ম এবং লোহা। এই সমীকরণ থেকে দেখা গেল, আয়ননেব পরিমাণ পারিপার্শ্বিক চাপের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। কেবলমাত্র এরই সাহায্যে বহু বিভ্রান্তির অবসান হল। পরের তিনটি গবেষণাপত্র

"এলিমেন্টস ইন দ্য সান", "অন দ্য প্রবলেমস অফ টেম্পারেচার রেডিয়েশন ইন গ্যাসেস"এবং "অন এ ফিজিকাল থিওরি অফ দ্য স্টেলার স্পেকট্রা" (এটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত — "অন দ্য হার্ভার্ড ক্ল্যাশিফিকেসন অফ স্টারস" পত্রটির পরিশোধিত রূপ) পর পর প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাপ আয়নন তত্ত্ব একটি বিশিষ্ট অবদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করল। এর একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হিসেবে সাহা ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে সূর্যের বর্ণালীতে সিজিয়ম বা রুবিডিয়ম কেন থাকবে না। কিন্তু যদি সূর্যদেহের অপেক্ষাকৃত কম তাপ বিশিষ্ট অংশের বর্ণালী নেওয়া যায় সেখানে এই মৌলগুলির উপস্থিতি দেখা যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। মাউন্ট উইলসনে যে অবজারভেটরি আছে তার পুরোনো রেকর্ড থেকে সৌরকলঙ্কের বর্ণালী বার করে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল লাল রুবিডিয়ম রেখা আছে। এই ফটোগুলি সাহা তত্ত্বের প্রকাশের অনেক আগে তোলা।

"এন সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" তারা শীর্ষক প্রবন্ধে স্যার আর্থার এডিংটন বলেছেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রগতিতে 1596 খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রিসিয়স পরিবর্তী ঔজ্জ্বল্যের তারা (মীরা সেতি) আবিষ্কারের পর সাহার তাপ আয়নন তত্ত্ব দ্বাদশতম গুরুত্বপর্ণ আবিষ্কার ।

এস রোজলাণ্ড তার বিখ্যাত বই 'থিওরিটিক্যাল অ্যাস্ট্রোফিজিক্স্রে'র ভূমিকায় বলেছেন ঃ

> যদিও বোর এবিষয়ে পথিকৃৎ, তবু ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাই (1920) প্রথম পরমাণু তত্ত্বের ভিত্তিতে তাবার বর্ণালীব একটি সুসঙ্গত তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। লকইয়ার যে সব প্রকল্প প্রকাশ করেছিলেন সাহার কাজে তাব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গাণিতিক ভিত্তি স্থাপিত হল। এই তত্ত্ব প্রকাশেব পব পদার্থেব রূপান্তর কল্পনা কবে বর্ণালীর ক্রম ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রইল না। এই তত্ত্ব প্রকাশের পর আশা হল যে বর্ণালীব সবিশেষ বিশ্লেষণ কবে তাবাব অবহমগুলের সম্পূর্ণ বিবরণ জানা যাবে। কেবল রাসায়নিক উপাদানই নয়, তাপমাত্রা, তাপ সাম্যের বিচ্যুতি যদি ঘটে থাকে, অবস্থান অনুযায়ী মৌলদের ঘনত্ব, আবহ-মণ্ডলের গতি প্রকৃতি ও বিভিন্ন উচ্চতায় অভিকর্ষের মানও জানা যাবে। সাহাব আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এক অভূতপূর্ব প্রেরণা জোগাল। বস্তুত পক্ষে এ বিষয়ে পরবর্তীকালে যে কাজ হয়েছে তাতে সাহার প্রভাব বর্তমান। পরের কাজে সাহার থিওরি পরিমার্জনা করে উন্নত করা হয়েছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবজারভেটরীর অধ্যাপক এইচ এইচ প্লাস্কেট'কে 18 ডিসেম্বর 1946 সালে লেখা এক চিঠিতে সাহা বর্ণনা করেছেন কেমন করে তিনি ঐ ফর্মুলায় উপনীত হন ঃ

তখন আমি জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার নানা সমস্যার সমাধানের রাস্তা ভাবছি আর এম.এস সি

ক্লাসে থার্মোডায়নমিকস এবং স্পেকট্রোসকোপি পড়াই। 1919 সালে তাপ আয়নন তত্ত্বের মূল কাঠামো আমার মানসে দানা বাঁধে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর আবার বিদেশী জার্নাল আসতে সুরু করেছে, এবং আমি জার্মান পত্রিকাগুলির নিয়মিত পাঠক ছিলাম। এই রকম জার্নাল পড়তে পড়তে একদিন 1919 সালের ডিসেম্বর মাসের ফিজিক্যার্লিশে সাইট স্ক্রীফট পত্রিকায় (পৃ 573) জে এগার্টেব একটি পেপার নজরে পড়ে - "উবার ডেন দিসোৎসিয়েশান—'সুস্টাণ্ড ডের ফিক্সস্টেরন্ গ্যাসে"। বাংলায় — 'স্থির নক্ষত্রের আয়নিত অবস্থা বিষয়ে'। তাবা দেহের গঠন বিষয়ে গবেষণায় এডিংটন অনুমান করে নিয়েছিলেন যে উচ্চতাপ মাত্রায় তাবার উপাদানের পরমাণুগুলি আয়নিক অবস্থায় থাকে। এই নিবন্ধে নার্নস্টের তাপ উপপাদ্য প্রয়োগ করে আয়ননের ব্যাখা করা ছিল। নার্নস্টের ছাত্র ও সহযোগী এগার্ট তাপ আয়ননের সূত্রটি বার করেন বটে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই সঙ্গে পরমাণু আয়রন বিভবেব গুরুত্ব ধরতে পারেন নি। অথচ ঐ সময়ে বোরের থিওরি এবং ফ্রাঙ্ক ও হার্টজের পরীক্ষামূলক নিবন্ধগুলি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ইলেকট্রনের আযনন বিভব পাবাব জন্য এগার্ট সাকুরের রাসায়নিক ধ্রুবক সূত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু এইভাবে তারার অভ্যন্তরে লোহার পরমাণুদের বহুধারা আয়নন ব্যাখা করতে গিয়ে আয়নন বিভবেব কাল্পনিক মান ব্যবহাব করেন।

এগার্টের প্রবন্ধটি পড়াব সময় আমি বুঝতে পাবি যে কোন বিশেষ মৌলের যে কোন চাপ ও তাপমাত্রায় এক বা একাধিক আয়ননের সঠিক হিসাব করতে এগার্টের সূত্র 'আয়নন বিভব' ঢোকান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই সূত্রটিতে পৌঁছলাম যার সঙ্গে আমার নাম এখন জড়িত। সৌরবর্ণ সমুদ্র ও তারাদেব তথ্য বিশ্লেষণের সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকায় তাব সমাধানে আমার সূত্রের প্রয়োগ কবতে দেবি হল না। পরের ছ মাসের মধ্যেই আমার প্রবন্ধগুলি পাঠিযে দিলাম ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে। এগুলি ভাবতে থাকার সময়ই পাঠানো হয়েছিল।

তাপ আয়ননের সমীকরণটি উত্তরকালে ডারউইন, ফাউলার মিলন, বেকার প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের হাতে আব উন্নত রূপ নেয়। সর্বশেষ উল্লেখ্য তাপ প্রয়োগে যে অনু বিয়োজিত হতে পারে এ ধারণা 1874 সালে স্যার নরম্যান লকইয়ারের মাথায় আসে। স্যার নরম্যান লকইয়ারের স্মরণে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাতে মেঘনাদ সাহা "বিয়োজনে সমতা" শীর্ষক একটি বিশেষ প্রবন্ধ লেখেন। লকইয়ার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করেন, এবং ধারাবাহিক ভাবে তাদের শ্রেণীবদ্ধ করেন, কিন্তু তাদের ব্যাখায় কোন সর্বজনগ্রাহ্য থিওরি দিতে পারেন নি। লকইয়ারের তথ্যগুলি সাজিয়ে সাহা সেগুলির অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। শেষ জীবনে স্যার নরম্যানকে অনেক বিরূপ সমালোচনা ও অসম্মানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সাহার লেখাগুলি বেরুবার পর লেডি এল এম লকইয়ার সাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান সার নরমানের অসম্মান দূর করার জন্য।

তাপ আয়নন তত্ত্বের সাহায্যে ক্রোমোসস্ফিয়ারের (বর্ণসমুদ্র) সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হল বটে, কিন্তু করোনা ও কবেনিয়মের সমস্যা থেকেই গেল। বহু বছর পরে 1942 সালে সাহা 'অন এ ফিজিকাল থিওরি অফ সোলার করোনা' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। তাপ আয়নন তত্ত্বটি বার করার একটি উপযুক্ত গবেষণাগারে এটিকে এক্সপেরিমেন্ট করে পরীক্ষা করার জন্য সাহা ইউরোপ যাবার জন্য উদগ্রীব হন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিতে পাওয়া টাকা ও ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটির দেওয়া অর্থানুকূল্যে ইউরোপে যাওয়া সম্ভব হল।

গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এক জাহাজে ইংল্যাণ্ড যাত্রাটি সাহার খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। তা ছাড়া ঐ একই জাহাজে ছিলেন ডঃ জীবরাজ মেহতা, অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত, নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বি এস গুহ এবং আগ্রার অধ্যাপক কে সি মেহতা। লণ্ডনে পৌঁছে দেখা হল পুরোনো সহপাঠীদের সঙ্গে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও স্নেহময় দত্তর সঙ্গে। স্নেহময় দত্ত তাকে পরামর্শ দেন অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে না গিয়ে অধ্যাপক ফাউলারেব সঙ্গে দেখা করতে । কারণ সাহার হাতে যা টাকা ছিল তাতে থাকার খরচ কুলোত না। সাহা লণ্ডনে থাকাই স্থির করলেন। এই সময়ই সাহার সঙ্গে ডঃ শান্তি স্বরূপ ভাটনগরের প্রথম পরিচয় হয়। অধ্যাপক ফাউলার খুব খুশী হলেন সাহা তার ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে চান জেনে। বর্ণালী বিজ্ঞান ও জ্যোতির্পদার্থ বিদ্যা এ দুটি বিষয়ে অধ্যাপক ফাউলাবের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তখন সাহার তাপ আয়নন তত্ত্বের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সুতরাং তিনি আর অপরিচিত ভারতবাসী নন। সেই সময় তারার বর্ণালী নিয়ে গবেষণা বহুলাংশে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতেই হত। ফাউলার সাহাকে পরামর্শ দিলেন জার্মানীতে প্রফেসার নার্নস্ট-এর কাছে যেতে, কারণ একমাত্র তাঁর লেবরেটরিতেই সাহাব থিওরি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট কবা সম্ভব। সাহা বিশ্ববিশ্রুত সার জে জে থমসনের সঙ্গেও দেখা কবে তাপ আয়নন তত্ত্ব বিষয়ে আলাপ আলোচলা করেন। কিন্তু বিখ্যাত ক্যাভিণ্ডস লেবরেটারিতেও উচ্চ তাপমাত্রায় গবেষণার কোন ব্যবস্থা নেই দেখা গেল, সুতরাং সেখানেও কাজ করার আশা ফলবতী হল না।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সদ্য শেষ হয়েছে। জার্মানীতে বৃটেনবাসী বা তাদের প্রজাদের খুব ভালো দেখা হত না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সাহার অনুরোধ গৃহীত হল। তখন অনেক ব্রিটিশ বা আমেরিকান বিজ্ঞানীদের জার্মানীতে নেওয়া হয় নি।

জার্মানীতে সাহা এক বছর ছিলেন নিজের থিওরী এক্সপেরিমেন্ট করে যাচাই করার চেষ্টায়। সে বছরটি সাহার কাছে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। আইনস্টাইন, প্লাংক প্রভৃতি বিশিষ্ট পদার্থবিদদের সংস্পর্শে আসেন। মিউনিখ সহরে বক্তৃতা দেবার আহ্বান পান সাহা। সেই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিউনিখে ছিলেন, সাহা সেখানে

বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা জানাতে যান। কবি সাহাকে শান্তিনিকেতন যাবার নিমন্ত্রণ করেন এবং সে নিমন্ত্রণ তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন।

সাহা একমাস সুইজারল্যাণ্ডে কাটান ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অক্সফোর্ডে একটি কনফারেন্সে যোগ দেন। অক্সফোর্ড থেকে যান কেমব্রিজে। সেখানে স্যার আর্থার এডিংটন তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। ঐ সময় বিখ্যাত চার্লস ডারউইনের পৌত্র সি জি ডারউইনের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়। সব মিলিয়ে সাহার ইউরোপের অভিজ্ঞতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল। এতে তাঁর জীবনের মূল মন্ত্রটিই প্রমাণ হল ঃ "তোমাকে কাজ করে যেতে হবে, স্বীকৃতি আসবেই।"

জার্মানী থেকে তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসার কারণ স্যার আশুতোষের কাছ থেকে বার্তা — তাড়াতাড়ি ফিরে পদার্থ বিভাগে খয়রা অধ্যাপক হয়ে যোগ দিতে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের অনেকের ধারণা যে অধ্যাপক ফাউলারেব অধীনে কাজ করার সময় মেঘনাদ সাহা 'অন এ ফিজিকাল থিওরি অফ স্টেম্ফাব স্পেকট্রা' পেপারটি লেখেন। স্যার নর্মান লকইয়ারের জীবনীতে প্রফেসার এ জে মেডোস পেপারটির উৎপত্তির বর্ণনায় লিখেছেন ঃ

> লকইযাবেব মৃত্যুর কিছু পরেই ইম্পিবিয়াল কলেজে ফাউলাবেব অধীনে কাজ করতে আসেন এক ভাবতীয় বিজ্ঞানী এম এন সাহা। এখানে থাকাব সময তিনি 'অন এ ফিজিকাল থিওরী ও স্টেলাব স্পেকট্রা' নামে যে পেপাবটি লেখেন তাতে পবমাণুব নতুন কোয়ান্টামবাদ ও বিয়োজন সাহায্যে তাবাব বর্ণালীর ব্যাখ্যা কবেন। প্রথমদিকে কিছুটা বিরুদ্ধতা হলেও শীঘ্রই মতটি গৃহীত হয। এই তত্ত্বে দেখা গেল যে তাবাদেহেব আবহমণ্ডলে পবমাণু বিয়োজন তাপমাত্রা ও চাপ দুই-এব উপবে নির্ভব করে। সুতবাং লকইযার এবং তাব বিরুদ্ধবাদীবা উভযের মতামতই আংশিক ভাবে ঠিক। তবে লকইয়ারেব সমর্থনে বলা যায তাবাব বর্ণালীতে চাপ অপেক্ষা তাপ মাত্রাব প্রভাবই প্রবলতব।
>
> সৌর আবহমণ্ডলেব গঠন বা তাবাদেব বর্ণালীব শ্রেণী বিন্যাস বিষয়ে লকইযারেব অন্য কাজগুলি লকইয়ারের মৃত্যুব আগেই বাতিল হযে যায ও বিস্মৃত হয। সাহা প্রথমে এই রচনাটির নাম দিযেছিলেন 'অন দি হারভার্ড ক্লাসিফিকেশান অপ স্টাবস,' ফাউলাব তখন মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হন যে এ বিষয়ে মৌলিক গবেযণাব অনেকটাই হযেছে সাউথ কেন্সিংটনে।

সাহার নিজেব লেখা থেকেই ব্যাপারটা পবিষ্কার জানা যায ঃ

> অধ্যাপক এ ফাউলাবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পবিচয় ছিল না, তবে আয়নিত হিলিয়ামেব বর্ণালী বিষয়ে তাঁব পেপারটি আমাব পড়া ছিল। ইংল্যাণ্ডে পৌছে আমি যখন অ্যালবার্ট ফাউলারের সঙ্গে দেখা করি উনি ভেবেছিলেন অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদেব

মত আমি ওঁর অধীনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস.সি ডিগ্রির জন্য কাজ করতে চাই। আমি যখন বলি যে আমি অল্পদিন থাকব এবং পরীক্ষা করে আমার তত্ত্বের সত্যতা নির্ণয় করার চেষ্টা করব, উনি খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না, তবে আমাকে ওঁর লেবরেটরীতে পড়ার ও কাজ করার অনুমতি দিলেন। সম্ভবত প্রথম যেদিন দেখা করি সেদিন আমার কথা শোনার মত তাঁর সময় ছিল না। সেটা 1920 সালের নভেম্বর মাস। ইম্পিরিয়াল কলেজের রেকর্ড ঘাঁটলে দেখা যাবে ডিগ্রি করার জন্য আমি নাম লেখাই নি। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো 'আযোনাইজেশান অফ দ্য সোলার ক্রোমোসস্ফিয়ার' প্রবন্ধটি ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে বেবোয়। ভাগ্যে আমি জার্নালটির প্রকাশক মিঃ ফ্রান্সিসের সঙ্গে নিজে দেখা করি। প্রবন্ধটি বেরোনর পর প্রফেসার ফাউলার আমার কাজের ও মতামতের উপর অনেক বেশি আগ্রহ নেন। তাকে আমি 'হারভার্ড ক্লাসিফিকেশন অফ স্টারস' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখাই। তিনি খুব মন দিয়ে প্রবন্ধটি পড়েন এবং মন্তব্য করেন — অধ্যাপক পিকাবিং এবং মিস ক্যানন প্রভৃতি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানীরাই কেবল এ বিষয়ে কাজ করেছেন তা ঠিক নয়। বরং লকইয়ারই এ বিষয়ে অগ্রনী। তিনি আমাকে লকইযারের, তাঁর ছাত্রদের এবং তাব নিজের সব পেপার পড়তে দেন। সেগুলি পড়ে আমি নিশ্চিত হই যে ফাউলার ঠিকই বলেছেন। তার পরামর্শে প্রবন্ধটির নাম বদলিয়ে করি 'অন এ ফিজিকাল থিওবি অফ স্টেলার স্পেক্টরা'। মূল পেপারটি 3 নং। ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন থেকে ফেরৎ নেওয়া হয় এবং ফাউলার অনুগ্রহ করে পরিবর্তিত প্রবন্ধটি রয়াল সোসাইটিতে ছাপার সুপারিশ করেন। 2 নং ও 4 নং পেপার দুটি যথারীতি ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনেই প্রকাশিত হয। পেপাবটি নতুন করে লিখতে আমার প্রায় চার মাস সময় লেগেছিল এবং এই চার মাস অধ্যাপক ফাউলারের সঙ্গে আলোচনার এবং বর্ণালী বিজ্ঞান ও জ্যোতির্পদার্থ বিদ্যায় তাঁব অগাধ পাণ্ডিত্যের সাহায্য পেয়েছিলাম। মূল ধারণা ও কাঠামো এক থাকলেও ফাউলারের কাছ থেকে পাওয়া নতুন তথ্য দিয়ে রচনা অনেক সমৃদ্ধ হল। উৎসাহের আতিশয্য বিপথে গেলেই তাব সমালোচনায় সামলিয়ে নিয়েছি।

উদাহরণস্বরূপ তিনি প্রায়ই বলতেন যে তারার বর্ণালীতে হাইড্রোজেন এবং সৌব বর্ণমণ্ডলে হিলিয়মের ক্ষেত্রে তাপ আয়নন তত্ত্ব খাটে না। এই যুক্তির থেকেই পবে তারাদেহের হাইড্রোজেন আধিক্যের উত্তর মেলে। কিন্তু আমি মনে করি না যে হিলিয়ামে যে অনিয়ম দেখা যায় তার কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা হয়েছে। আমার 'অন এ ফিজিকাল থিওরি অফ সোলার করোনা'-তে আমি একটি ব্যাখ্যা দিয়েছি। 'অন এ ফিজিকাল থিওরি অফ সোলার ক্রোমোস্ফিয়ার' পেপারটি রয়াল সোসাইটির সভায় পড়ি। সেই সভায় অধ্যাপক ফাউলার কাজটির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 1859 সালে বিশফের বর্ণালী ব্যাখ্যার পর থেকে জ্যোতির্পদার্থ বিদ্যায় এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এবং এর সাহায্যে আরও অনেক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

চার

স্থিতির কাল
(1923-1937)

কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে ফিরে সাহা এক বিচিত্র অবস্থার সামনে পড়লেন। গুরুপ্রসাদ সিং খয়রা অধ্যাপক পদ যদিও দানের টাকায় তৈরী হয় কিন্তু সরকার স্যার আশুতোষের প্রসারণের পরিকল্পনাকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। সাহা দেখলেন খরচ করার মত টাকার ব্যবস্থা নেই। তাঁর হাত পা বাঁধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসমস্যা নিয়ে আশুতোষের সঙ্গে সরকারের তীব্র বিরোধ চলছে। এই বিরোধ শীঘ্র নিষ্পত্তিব কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না।

গভর্নর লর্ড রনাল্ডসে স্নাতকোত্তর বিভাগগুলির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেও কিন্তু একই সঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ

> কোন গরীব দেশের এই সব বিষয়ে চর্চার টাকা সরকাবী তহবিল থেকে গ্রহণ করাও একটা সীমা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য আশা কবি আইন সভা কিছু বাড়তি অর্থ মঞ্জুর করবেন। তবে আইনসভাব নিজেরই সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত — তার আরো প্রয়োজনীয় দাবী আছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিন্তা করে দেখতে হবে তারা যে সব বিষয়ে পরীক্ষা নেয় ও ডিগ্রী দেয তাব সবগুলিই পঠন পাঠনেব ব্যবস্থা করবে কিনা।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনা থেকে বোঝা গেল আইনসভার এরকম কোন বাসনাই নেই। 1922-23 সালের বাজেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয় লাখ টাকা বরাদ্দ হল, কলকাতাকে কিন্তু আগের 1,41,000 টাকাতেই তুষ্ট থাকতে হল। শিক্ষামন্ত্রী না ভেবেচিন্তে খরচ বাড়িয়ে যাওয়ার তীব্র সমালোচনা করে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় যদি ভেবে থাকে সরকারী দাক্ষিণ্যের উপর ভিত্তি করে কাজকর্ম চালাবে তবে তা গর্হিত অপরাধ ।

আশুতোষ এরকম কথা চুপচাপ শুনে যাবার পাত্রই ছিলেন না। এক সমাবর্তন ভাষণে তিনি এর যোগ্য উত্তর দিলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন এর কোনটাই না বুঝে করা হয়নি। সরকার থেকে তাঁকে আড়াই লাখ টাকার অনুদানের প্রস্তাব করা হল তবে কিছু সর্ত সাপেক্ষে। আশুতোষ এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন,

> আমরা সরকারি মহাকরণের অংশ হতে অস্বীকার করি। এক হাতে টাকা আর অন্য হাতে দাসত্ব দিতে চাইলে আমি ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করব। সে টাকা আমরা গ্রহণ

করব না। আমরা ব্যয় সংকোচ করে চালাব। আমরা বাংলা দেশের দ্বারে দ্বারে যাব, জনসাধারনদের বোঝাব তাদের দায়িত্ব কি। আমাদের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপকরা বরং অনাহারে থাকবেন, কিন্তু তবু স্বাধীনতা বিসর্জন দেবেন না।

এইভাবে যুদ্ধ ঘোষণা হল, সংকট আরও ঘনীভূত হতে লাগল। তখন জনসাধারণের সমর্থন আশুতোষের দিকে, ঠিক সেই সময় অর্থাভাবের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালেয় ছেড়ে যাওয়াতে সাহাকে অনেক বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টে এক্স-রে সংক্রান্ত পরীক্ষার তেমন যন্ত্রপাতি ছিল না। সাহা ভাবছিলেন প্রথমে এই দিকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সংগ্রহ করবেন। অধ্যাপক রামনের এক্সপেরিমেন্ট হত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে। রামন ও সাহার মধ্যে মতভেদ বেশ গুরুতর আকার ধারণ করে। রামন আবার এদিকে ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। স্যার আশুতোষ রামনের পক্ষ সমর্থন করায় সাহার পক্ষে অন্যত্র সুযোগের সন্ধান করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 700-1000 টাকা বেতনের প্রস্তাব দেয়। তা ছাড়া গবেষণার জন্য পৃথক অনুদানও ছিল। তখন খয়বা অধ্যাপক হিসেবে সাহা পাচ্ছিলেন 500 টাকা এবং বাড়ীভাড়া। সিণ্ডিকেটের কাছে একটি পত্রে সাহা কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করলেন[২০]। তিনি লেখেন আমি নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করতে রাজী আছি কিন্তু আমাকে যেন 650-50-1000 এই গ্রেডে মাইনে দেওয়া হয়। এবং আমার ব্যক্তিগত রিসার্চ গ্রাণ্ট হিসাবে অবিলম্বে যেন 15,000 টাকা দেওয়া হয়। উত্তরে সিণ্ডিকেট জানান –"বিশ্বদ্যিালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং অন্য অধ্যাপকদের দাবীর কথা চিন্তা করে এই অনুরোধ রাখা সম্ভব হবে না।"

সাহার চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যালকাটা রিভিউতে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। তবে চলে যাবার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণও ছিল।

অনেক জায়গা থেকে আমন্ত্রণ এল। আলিগড়, বেনারস ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে আহ্বান জানান হয়। সাহা এলাহাবাদে যাওয়া মনস্থ করলেন। ইতিমধ্যে কোদাইকানালের সৌর মানমন্দিরের ডাকে তিনি সাড়া দেন নি। এলাহাবাদ ভারতের পাঁচটি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। পাঞ্জাবের পাঁচবছর ও কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের তিরিশ বছর পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্ভবত এখানে যাওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। এখানে তাঁর দুই পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এ সি ব্যানার্জী ও এন আর ধর। বয়সে বড় হলেও এঁরা ছিলেন সাহার বিশেষ বন্ধু। এ সি ব্যানার্জী পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। এন আর ধর এখনও জীবিত । তিনি ভারতের বিজ্ঞানজগতের এক কিংবদন্তী পুরুষ । সাহা এঁদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। এছাড়া এলাহাবাদে অধ্যাপক পদের বেতনও বেশি ছিল। সাহা এখানে বিভাগীয় প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হলেন। বিভাগের অন্য অধ্যাপক ও শিক্ষকরা কেউই তাঁর ধারে কাছে

আসার মত ছিলেন না। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম থাকলেও সেই সময় ফিজিক্সে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনের মত পরিস্থিতি ছিল না। উত্তর ভারতের সব জায়গা থেকে ভাল ছাত্রেরা এলাহাবাদে আসত। কর্তৃপক্ষ এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা চাইতেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হোক, তবে তার পথ সব সময় খুব সুগম ছিল না।

ফিজিক্স ল্যাবরেটরীর কথাই ধরা যাক। বি.এস.সি পর্যায়ের পক্ষে এটি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু উচ্চতর গবেষণার কোনরকম ব্যবস্থা এখানে ছিল না। ওয়ার্কশপে বিদ্যুৎ ছিল না, লাইব্রেরীতেও আধুনিক পত্র পত্রিকার অভাব ছিল। এ ব্যাপারে সাহা অনুযোগ করলে ট্রেজারার সরলভাবে প্রশ্ন করেন- লাইব্রেরীতে যত বই আছে সব কি তিনি পড়েছেন? তা যদি না পড়ে থাকেন তাহলে এখনই বেশি বই কেনার কথা আসে কেন? এলাহাবাদে প্রথম কয়েক বছর কাটল ডিপার্টমেণ্টকে সুসংহত করে তুলতে। এই সময় তিনি প্রধানত বক্তৃতা ক্লাসে দেখাবার মত এক্সপেরিমেণ্ট তৈরী করেছেন। তিনি নিযমিত ভাবে আণ্ডার গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে বক্তৃতা দিতেন। খুব পরিশ্রম করে এই বক্তৃতাগুলি তৈরী করতেন তিনি। এমন কি অনেক সময় ব্ল্যাকবোর্ডের উপর স্পষ্ট অক্ষরে বক্তৃতাব কিছু অংশ লিখেও দিতেন। ক্লাসে ল্যানটার্ণ স্লাইড দেখান হত এবং প্রভূত পরিমাণে হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখান হত। ছাত্রদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠগুলিকে বেছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত করে তোলার এই চেষ্টা তাঁর বড় মনোমত ছিল। ঐ একই সময়ে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকাতেও একই কাজে ব্যস্ত ছিলেন—ছাত্র গড়ে তোলা। সাহার চেষ্টায় শীঘ্রই এলাহাবাদে এমন সব ছাত্র তৈরী হল যাদেব নিযে বিশ্ববিদ্যালয কেন সমস্ত দেশ গর্বিত হতে পারে।

এলাহাবাদে গবেষণাব কাজ শুরু করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের পরিবেশে যে স্বাভাবিক গবেষণার আবহাওয়া ছিল এখানে তার কোন চিহ্নই ছিল না। ওয়ার্কশপ, লাইব্রেরী এবং ল্যাবরেটরীকে উন্নত করার যত চেষ্টাই সাহা করেন কর্তৃপক্ষের অনীহার কাছে বাধা পায়। কিন্তু সাহা দমে যাবার লোক ছিলেন না। তাঁর প্রথম সহগবেষক এন কে সুরের সঙ্গে যৌথ ভাবে তিনি তাপীয় আয়নীভবন পরখ করে দেখার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করলেন। মুর ছিলেন ইউইং ক্রিশ্চান কলেজের লেকচারার। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট টাইম পড়াতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসের চাপ এত বেশি ছিল যে কলেজ খোলা থাকলে অন্য কাজের সময় পাওয়া যেত না। তাঁদের কাজ করার একমাত্র সময় ছিল গরমের ছুটি। প্রচণ্ড গরম পড়ত এলাহাবাদে—তাপমাত্রা 47° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছত । সাহা ও তাঁর গবেষকগোষ্ঠীর সকলে এই গরম উপেক্ষা করেও কাজ চালিয়ে যেতেন। এন কে সুর ছাড়াও ছিলেন পি কে কিচলু, ডি এস কোঠারি এবং কে মজমদার । তাঁদের পরিশ্রমের ফল অবশেষে ফলল। প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে

শুরু হল। ফিজিক্স বিভাগে এক নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিল। তবে মহানগরী থেকে দূরে থাকার কতকগুলি অবধারিত অসুবিধাও ছিল। ফলাফল জানাতে দেরী হবার জন্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করা যায় না। এইভাবে কমপ্লেক্স স্পেকট্রা বা জটিল বর্ণালীর উৎস সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখা প্রকাশিত হবার আগেই এফ পাণ্ডে তাঁর ফলাফল প্রকাশ করে দেন।

1926 সালে সাহা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত শাখার সভাপতিত্ব করেন। পরের বছর তিনি ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন। সেই বছরই ইতালী সরকার তাঁকে সে দেশে আমন্ত্রণ জানান। উপলক্ষ্য ছিল ভোল্টা শতবার্ষিকী । লণ্ডনে রয়াল সোসাইটি সম্মেলনে যাবার পথে তিনি এই শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দেবার জন্য ইতালীর লেক কোমোতে যান। বিজ্ঞানী ভোল্টার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সারা পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সমাগম হয়েছিল। খুবই অভূতপূর্ব এই সম্মেলন। এক সপ্তাহ ধরে এই সম্মেলন চলে। রাশিয়া সহ ইউরোপের সমস্ত দেশ এখানে তাদের প্রতিনিধি পাঠায়। বাংলা পত্রিকা প্রবাসীতে সাহা এই সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ লেখেন। তিনি লেখেন, বলকান রাজ্যগুলি থেকে কোন প্রতিনিধি আসেন নি তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও জাপান থেকেও বিজ্ঞানীরা এসেছিলেন। ভারত থেকে সাহা ছাড়া ছিলেন সস্ত্রীক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অনিল কুমার দাশ। মুসোলিনী এঁদের সকলকে চা -পানে আপ্যায়িত করেন। প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা ছাড়াও প্রতিনিধিদের নিয়ে ইতালীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখান হয়।

ফেরার পথ সাহা যান নরওয়ে। সেখানে উত্তর অক্ষাংশে রিংবুতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করার জন্য এক বিজ্ঞানীদের অভিযান যাচ্ছিল। সাহা তাদেব সঙ্গে যোগ দেন। এই অভিযানে অধিনায়ক ছিলেন অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এল ভেগার্দ। এই অভিযানের বিশদ বৃত্তান্ত সাহা এক বাংলা পত্রিকাতে প্রকাশ করেন, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখার এক আদর্শ উদাহরণ এই রচনা । এই যাত্রাতেই তিনি বার্লিন এবং কোপেনহেগেনও ঘুরে আসেন। সেই সময় বার্কলের ই ও লরেন্সও ছিলেন কোপেনহেগেনে। পরে সাহা তাঁর ছাত্র বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরীকে এই লরেন্সের কাছেই সাইক্লোট্রনের কাজ করতে পাঠান।

রয়াল সোসাইটির সদস্য হওয়াতে একটা সুবিধা হল। গবেষণার জন্য টাকার সমস্যা তখনকার মত দূর হল। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর সার উইলিয়ম মরিস এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য সাহাকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর গবেষণার জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা অনুমোদন করেন। এখনকার হিসাবে এই টাকা খুবই সামান্য হলেও 1927 সালে এর মূল্য নেহাত কম ছিল না।

এলাহাবাদে ফিরে এলেন সাহা। জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান ও তাপীয় আয়নন বিষয়ে গবেষণা চলতে লাগল। পদার্থবিদ্যার অন্যান্য বিভাগের তিনি গবেষণা ও অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন—তার মধ্যে ছিল পরিসংখ্যক বলবিজ্ঞান, অণু ও পরমাণুর বর্ণালী বিজ্ঞান, ইলেকট্রোনেগেটিভ মৌলদের ইলেকট্রন আসক্তি, নাইট্রোজেনের সক্রিয় রূপান্তর, উচ্চতাপে অণুদের বিয়োজন, আয়নমণ্ডলে রেডিও তরঙ্গের বিস্তারণ এবং আয়নমণ্ডলের উচ্চস্তরের ভৌত ধর্ম। গবেষণার পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয় যাতে থিওরি ও এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। তাঁর ছাত্রেরা যুক্তভাবে ছাড়া একক ভাবেও কাজ করে গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে থাকেন। ক্রমে এঁদের মধ্যে অনেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুনামের অধিকার হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আর কে সুর, জি আর তোষনিওয়াল, রমেশচন্দ্র মজুমদার, আত্মারাম, টি ভার্গব, এস সি দেব, এ কে দত্ত, আর সি শর্মা, জে বি মুখার্জি, এল এস মাথুর, এ এন টাণ্ডন, আর এন রায়, কে বি মাথুর, এন কে সাহা, জি এস সুর, বি এন শ্রীবাস্তব, এস মুরুলেকর, বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরী ও কে আর সাহা।

গবেষণা ছাড়াও ক্রমে অন্যান্য দিকে সাহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকে। পরে সেগুলির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পড়ানোতে তাঁর আগ্রহ কখনই কমেনি। তাপ, কাইনেটিক থিওরি অফ ম্যাটার এবং স্ট্যাটিসটিকাল মেকানিকসের উপর দেওয়া ক্লাসের বক্তৃতাগুলি থেকেই তাঁর বিখ্যাত পাঠ্য বই "টেক্সট বুক অন হিট" লেখা হয়। এই বইয়ের অপর লেখক ছিলেন বি এন শ্রীবাস্তব। বইটি 1931 সালে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায দুই লেখক আণ্ডাব গ্রাজুয়েট ছাত্রদের সাহায্য স্বীকাব কবেছেন। মুখবন্ধে স্যাব সি ভি রামন লেখেন ঃ

> তাপগতিবিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপক সাহাব জ্ঞান তাঁকে যেমন পদার্থবিদ্যা ও বসাযনেব বিভিন্ন তত্ত্বে এটি প্রয়োগ কবে বিশিষ্ট গবেষণার দিকে চালিত করেছে ঠিক তেমনই এই বিষযে স্পষ্ট কবে ব্যাখ্যা কবাব যোগ্য করে তুলেছে। প্রথমে কলকাতা ও পবে এলাহাবাদে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তক। একজন তরুণ লেখকের সাহায্যে লেখা এই বইয়ে আছে দৃষ্টিভঙ্গীব অভিনবত্ব ও বিস্তার। সেই সঙ্গে আছে নিখুঁত ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা। তাপতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্য দিযে একটি বই লেখার প্রয়োজনীযতা অনুভব করে এই কষ্টসাধ্য কাজ শেষ করার জন্য অধ্যাপক সাহা দেশে ও বিদেশে অগণিত পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। আমরা আশা করি, সেই সব পাঠকেরা এই বইটি ভালভাবে পাঠ করে তার গুণ বুঝতে পারবে। পরবর্তী সংস্করণ বর্ধিত আকারে 'ট্রিটিজ অন হিট' নামে 1935 সালে প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে প্রতিটি সংস্করণ সর্বাধুনিক তথ্য নিয়ে বেরোচ্ছে এবং আজও বইটি জনপ্রিয়। আজও সামারফেল্ড[23] তার নিজের লেখা 'থার্মো ডাইনামিকস' বই-এ সাহার একটি বর্ণনাকে —দুটি বস্তু শ্রেণীর মধ্যে বা একই বস্তুর দুই

অংশের তাপীয় সমতার শর্ত হল দু দিকের তাপ মাত্রা সমান হতে হবে— তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র। এটি আর, এইচ, ফাউলারের পরামর্শ বলে পাদটীকায় স্বীকৃতি আছে।

বিজ্ঞানের স্নাতকদের জন্য "টেক্সট্ বুক অফ হিট"- এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর সপ্তদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1967 সালে — তাতেই বইটির জনপ্রিয়তা কিছুটা বোঝা যাবে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাহা সেখানে অ্যাটমিক ফিজিক্সের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার নোটগুলি পরিমার্জিত করে ছোট বইও প্রকাশিত হয়। কোন কাজই অসমাপ্ত ফেলে রাখা তাঁর চরিত্রে ছিল না। এই বক্তৃতামালা 1931 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সিক্স লেকচার্স ইন অ্যাটমিক ফিজিক্স' এই নামে প্রকাশিত হয়। কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ মেঘনাদ সাহার প্রথম খণ্ডে এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নলিনীকান্ত সাহার সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি আব একটি বই লেখেন — ট্রিটিজ অন মর্ডাণ ফিজিক্স। সেটি প্রকাশিত হয় 1935 সালে। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে। এই বইটি কিন্তু তেমন সাড়া জাগায়নি। এটি পরে পবিমার্জনাও করা হয় নি।

গবেষণার কাজ বেশ দ্রুতগতি এগোতে লাগল। 1930 সাল নাগাদ ফিজিক্স বিভাগ সারা দেশের বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ছাত্রদেব গুণগত মানেরও অনেক উন্নতি হল। সাহা নিজেই আণ্ডাব গ্রাজুয়েট ক্লাস নিতেন । ফলে বহু ছাত্র তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেত। তিনি ছিলেন তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। তবে গবেষণা সকলের জন্য নয়— সাহা এটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পাবতেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাঁর বহু ছাত্র ভাল ফল দেখিয়েছে। তবে দৌলত সিং কোঠারীকে তিনি এই পরীক্ষায় বসা থেকে নিবৃত্ত করেন। কোঠাবী পরে ইউরোপে গিয়ে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে খুব ভাল কাজ করেন। তাঁর সেই কাজ এখন জ্যোতিষ পদার্থ বিজ্ঞানের অধীত বিষয়ের মধ্যে পড়ে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার শাহ মহম্মদ সুলেমান ছিলেন সাহার বিশেষ বন্ধু। অল্প বয়স থেকে তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল। তখন জজিয়তির অবসরে তিনি বিজ্ঞানের ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করে সাহাকে অনুরোধ করেন এমন ছাত্রকে তাঁর কাছে পাঠাতে, যিনি বিজ্ঞানের নবতম অগ্রগতির খবর তাঁকে জানাতে পারবেন। সাহা এই কাজের জন্য কোঠারীকে নির্বাচন করেন—সেটা স্যার মোহম্মদ সুলেমানের বেশ মনোমত হয়। তিনি এমন কি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রতিভাবান গবেষকটির নিজে থেকেই প্রশংসা করে চিঠি দেন।

এমন একটা সময় ছিল যখন প্রশাসনে, রেলবিভাগে, পুলিস, আবহদপ্তর ও বিভিন্ন মন্ত্রকে সাহার ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কার পক্ষে কোন ধরণের কাজ ঠিক হবে বিচার করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। জ্ঞান মুখার্জ্জী ছিলেন তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হতে পারলেন না। এদিকে গবেষণা করার মত মানসিক প্রবণতাও তাঁর ছিল না। অথচ তাঁর ছিল নানা বিষয়ে আগ্রহ, যেটা সচরাচর বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না। সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হতে সাহা তাঁকে অনুরোধ করলেন। এই পত্রিকার গোড়ার দিকের সাফল্যের অনেকটাই কিন্তু জ্ঞান মুখার্জ্জীর জন্য। পরে সাহারই উৎসাহে মুখার্জ্জী ফিল্মে যোগ দেন এবং পরিচালক হিসেবে নাম করেন। যে সাহা কখনও সিনেমা দেখতেন না তিনি কিন্তু ছাত্রের এক ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

জীবিকা নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্রেরা প্রায়ই তাঁব কাছে আসত। সাহার মতামতের মূল্য ছিল অপরিসীম। আত্মচরণ নামে তাঁর এক ছাত্র হঠাৎ প্র্যাকটিকাল ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেয়। সাহা জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই উত্তর শুনে কিন্তু সাহা মোটেই রাগ করলেন না। উল্টোটি বললেন, ক্লাসে এসে সময় নষ্ট না করে সে ববং নাম কাটিয়ে ফেলুক। আত্মাচরণ তাই করলেন। পরে গান্ধী হত্যা কেসের অন্যতম বিচাবপতি হিসেবে তিনি খুবই সুনাম অর্জন করেন।

ছাত্রজীবন শেষ হয়ে যাবার পরেও বরাবর সাহার ছাত্রেরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁদের কাজকর্মের ব্যাপাবে সাহাও খুব আগ্রহ রাখতেন। ছাত্রদেব সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। 1945 সালে বাশিযান বিজ্ঞান আকাদেমীর দুশো বর্ষ পূর্তির উৎসবে ভাবতেব প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সাহা। ইরান হযে যাবার কথা ছিল।. করাচীতে ইরানের কনসাল জেনারেলেব অফিস থেকে ভিসা করতে হবে। তখন করাচী বন্দরে রেল পরিবহণের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্র — মনীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রী চক্রবর্ত্তী নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে ভিসা প্রভৃতিব সব ব্যবস্থা করে দেন। পরে এই চক্রবর্ত্তীকেই তারাপুরের পবমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভাবা মনোনীত করেন।

এলাহাবাদে সাহার বাড়ীর দরজা ছাত্রদের জন্য সব সময়েই খোলা থাকত। এখানে আসার পর তিনি প্রথমে জর্জ টাউনে একটি বাড়ী ভাড়া করেন। পরে বেলী রোডে তাঁর নিজের বাড়ী তৈরী হয় — বাড়ীর নাম ছিল সায়েন্স ভিলা। বিরাট এই বাড়ী দেখে তাঁর পূর্বপরিচিত গোপাল দাস নামে এক ভদ্রলোক নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। কলকাতা থেকে তিনি এলাহাবাদে বেড়াতে এসেছিলেন। চিলু কোঠারী, রমেশ মজুমদার ইত্যাদি বহু ছাত্র ও গবেষক কোন না কোন সময় এই বাড়ীতে কাটিয়েছেন। নলিনীকান্ত সাহা তাঁর স্মৃতিকথায় এ বিষয়ে লিখেছেন ঃ

মেঘনাদ সাহা আমাকে একেবারেই চিনতেন না। কিন্তু হঠাৎ আবেগের বশে আমি তাঁকে একখানা চিঠি লিখে বসি। আমি লিখি এলাহাবাদে গিয়ে তাঁর কাছে গবেষণা করা আমার একান্ত বাসনা। অপ্রত্যাশিত ভাবে উত্তর এসে গেল — খুব তাড়াতাড়ি গোটা গোটা অক্ষরে দীর্ঘ চিঠি — এতে আমাদের দেশে গবেষণার অসুবিধার কথা স্পষ্টভাবে বলা ছিল। কোন রকম ভণিতা না করে সাহা আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন — গবেষকের জীবন সম্পর্কে কোনরকম মোহ থাকলে তা যেন আমি পরিত্যাগ করি। অন্য যেকোন কাজের মত গবেষণাও পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং সাদামাটা। রিসার্চ স্কলারশিপ দেবার কোন অঙ্গীকার তিনি করেন নি। তবে আমি যদি যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারি তাহলে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল এই চিঠিতে। আমার সংবেদনশীল তরুণ মনে চিঠিটি গভীর ছাপ ফেলেছিল। আমার মনে হল বাইরে থেকে রুক্ষ হলেও এর আড়ালে আছে আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সুর। আমার বন্ধুরাও উৎসাহ দিল। অগত্যা এলাহাবাদ পাড়ি দিলাম। এই চিঠি পাবার এক হপ্তা পরে এক সন্ধ্যায় সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে উপস্থিত হলাম বেলী রোডের বাড়ীতে। বাড়ীর লনে বসে মেঘনাদ সাহা কিছু পড়ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি চিনতে পারেন, মিষ্ট কথায় ভিতরে আসতে বললেন। বাড়ীর এক তলার একটি ঘরে আমার স্থান হল। পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে কিছু প্রশ্ন করে আমার ফিজিক্স সম্পর্কে কতদূর জ্ঞান যাচাই করে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমার সারা দিনের কাজ কর্মের রুটিন ছকে দিলেন। সেটি এই রকম ঃ তাঁর পড়ার টেবিলে আণবিক ও পারমানবিক স্পেকট্রোসকোপি সম্পর্কে যে বইগুলি ছিল সেগুলি পড়ে ফেলা। এ বিষয়ে সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পড়া, ল্যাবরেটরীতে যারা কাজ করছে তাদের সাহায্য করা, মাঝে মাঝে যা পড়েছি তার সারাংশ লিখে ওঁকে দেখান। কয়েক সপ্তাহ এইভাবে চলল। আমার নোটগুলির উপর উনি চোখ বোলাতেন, বিশেষ কোন মন্তব্য করতেন না। অবশেষে মনে হল আমার ভবিষ্যত কাজের পরিকল্পনা তিনি ঠিক করে ফেলেছেন। আমি এলাহাবাদে যাবার প্রায় ছ মাস পরে তিনি আমাকে একটি প্রবলেম দেন। উনি তখন ল্যাবরেটরীতে কয়েকজন সিনিয়র গবেষকের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আমি চুপচাপ তাঁদের কথাবার্তা শুনছিলাম। তখন উনি আমাকে বললেন জৈব হ্যালাইডের অবিচ্ছিন্ন শোষণ বর্ণালীর উপর তুলনামূলক পরীক্ষা করতে। বললেন, অন্যদের অসুবিধা না ঘটিয়ে আমি যেন ল্যাবরেটরীর এক পাশে আমার যন্ত্রপাতি বসাই।

তিরিশের দশকে বাসন্তী দুলাল নাগ চৌধুবী তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত এই সন্দেহে পুলিস হোস্টেলে তাঁর ঘর খানা তল্লাসী করে ও তাঁকে কয়েকদিন আটকে রাখে। খবরটি সাহার কানে যেতেই তিনি তৎক্ষনাৎ গাড়ী পাঠিয়ে নাগ চৌধুরীকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। এই ঘটনায় সাহা খুবই ক্ষুদ্ধ হন। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে বিপ্লবী দলে যোগ না দিয়ে বরং মন দিয়ে কাজকর্ম করলেই দেশের গৌরব বৃদ্ধি হবে। এর পরে প্রায় তিনমাস নাগ চৌধুরী কার্যত তাঁর বাড়ীতে নজর বন্দী ছিলেন।

1928 থেকে 1938 সাহার পক্ষে খুবই কর্মব্যস্ত সময় ছিল। একদিকে সৃজনশীল কাজের চাপ অন্যদিকে তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। ছাত্রদের গবেষণা তখন মোটামুটি আয়ত্তে এসে গেছে। কোন ছাত্রের মধ্যে মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতা দেখলে সাহা তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে উৎসাহ দিতেন। এইভাবে পি কে কিচলু, ডি এস কোঠারী এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী গবেষণা সুরু করেন। পদার্থ বিদ্যায় তখন নতুন তথ্য, নতুন সূত্র, নতুন ভাবনার উন্মেষ হচ্ছে। এলাহাবাদের এই গবেষকরা পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে তার খবর রাখতেন ও নিজেদের মধ্যে সেই নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। নিয়মিত ভাবে এই সব আলোচনা সভা বসত। এতে শুধু যে অধ্যাপক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং নতুন গবেষকরা যোগ দিতেন তাই নয় —এম.এস.সি ক্লাসের ছাত্রেরাও যোগ দিত। সৌব কীরিটের বর্ণালী, বিটা-ক্ষয়, অজৈব লবণের রং বা নিষিদ্ধ রেখা সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হত। এন কে সাহার স্মৃতিচারণ থেকে সেই উদ্দীপ্ত ও উত্তেজক আবহাওয়া কিছুটা অনুমান করা যায় ঃ

> এই সময় (সম্ভবত 1934 সালের নভেম্বর মাসে) কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপব কতকগুলি বিশেষ স্মৃতি বক্তৃতা দিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অধ্যাপক সাহাকে অনুরোধ করা হয়। সেই সময় নিউট্রন নামে মৌল পরমাণু কণাটি সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে (বোথে, 1930) । ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটবীতে চ্যাডউইক প্রথম একে সনাক্ত কবেন (1912) তাছাডা রোমের এনরিকো ফার্মি ও তাঁর সহকর্মীদের ধীরগতি নিউট্রনেব দ্বারা কোন কোন মৌলদের তেজস্ক্রিয় হওয়া সম্পর্কে কাজটিও সদা প্রকাশিত হয়েছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে একদিন বিকেলবেলা অধ্যাপক সাহা উত্তেজিত ভাবে ফার্মির প্রবন্ধটি হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন। ফার্মির লেখাটি লণ্ডনেও রয়াল সোসাইটির প্রসিডিংসে ছাপা হয়েছিল। অধ্যাপক সাহা এই দিকে গবেষণার গতি কি হতে পারে এবং পরমাণু তত্ত্বের বিবতনে এর কি প্রভাব হতে পারে তা নিয়ে মুখে মুখে আলোচনা করতে লাগলেন। নিউট্রন ও তার ধর্ম সম্পর্কে তিনি সেই সময় খুব গভীর চিন্তা করছিলেন তাই এই বিষয়েই বক্তৃতা দেবেন ঠিক করলেন। তারপর কয়েকদিন আমরা একসঙ্গে বসে এই বিষয়ে যত পেপার বেরিয়েছিল পড়ে তার বিশ্লেষণ করতে লাগলাম।
>
> বক্তৃতার খসড়া তৈরী হতে দেরি হল না। কে জানত যে পরে অধ্যাপক সাহার গবেষণার আগ্রহ এইদিকে পরিবর্তিত হবে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 1936 সালের 8 ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান ফিজিকাল সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধে সাহা মৌলিক সূত্রের দৃষ্টি থেকে একমেরু চুম্বকের চৌম্বক-প্রাবল্য হিসাব করার একটি পদ্ধতির বর্ণনা দেন। তাঁর প্রবন্ধে বিষয় ছিল 'নিউট্রন ও প্রোটনে ভরের উৎস।' এটি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সের দশম খণ্ডে প্রকাশিত হয় (পৃষ্ঠা 141, 1916)। এর আগে 1931 সালে পি এ এম ডিরাক বলেছিলেন কোয়াণ্টাম

বলবিদ্যা অনুযায়ী $\frac{e}{2\alpha}$ মেরুপ্রাবল্য সমন্বিত একমেরু (মনোপোল) চুম্বকের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে।

উচ্চ-শক্তি ফিজিক্স এবং মৌল কণা বিষয়ে ধারণা অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই সব চৌম্বক মনোপল কিন্তু তখনও সনাক্ত করা যায় নি। এর প্রাসঙ্গিক সূত্রটিকে বলা হয় ডিরাক-সাহা সূত্র।

1930 সাল নাগাদ সাহা ঠিক করলেন তিনি গরেষণাগারের গজদন্ত মিনাব থেকে বেরিযে আসবেন। কথাটি তিনি নিজেই ব্যবহার করেন। অনেক দিক দিয়েই তিনি ছিলেন সমকালের চেয়ে এগিয়ে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সমাজেব প্রয়োজনের একটা সমন্বয় ঘটবার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানে শৌখিন, অপেশাদারী গবেষকেব যুগ তখন শেষ হতে চলেছে। যোগাযোগ আর সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব ক্রমে বাড়ছিল। ভারতের মত বিশাল দেশের বিভিন্ন কোণে একা যাঁরা বিজ্ঞান সাধনা করে চলেছেন তাঁদেব বিজ্ঞান চর্চার মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এমন একটা সংস্থার প্রয়োজন ছিল যেখানে মিলিত হয়ে তাঁবা ভাবের আদানপ্রদান করতে পারেন।

1930 সালে এলাহাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিযেশনের একটি মিটিঙে যুক্ত প্রদেশের সব বিজ্ঞানীরা এসেছিলেন। এঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইউ.পি'র গভর্ণর সার ম্যলকম হেলি। তিনি বলেন[25]ঃ

> আমি ভাল কবেই জানি যে এই সব সমস্যার (অর্থনৈতিক এবং প্রয়োজনীয়) দিকে মন দেবার বা সেদিকে সচেষ্ট হবার পক্ষে আমাদের গবেষক ও ছাত্রদেব কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আমি এও জানি যে তাদেব সঙ্ঘবদ্ধ কবাব কোন প্রয়াস বাইবে থেকে আবোপ কবা যাবে না। নিজেদেব চেষ্টাতেই করা সম্ভব। বড় জোব এই প্রদেশে যত বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড চলছে তাদেব প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কোন বিজ্ঞান আকাদেমী এদের উপদেষ্টা হিসেবে নির্দেশ দিতে পারেন। এইরকম কোন কার্যকর সঙ্ঘ গড়ে তুললে এবং জনসাধাবণকে যদি বোঝানো যায় যে আগে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিজ্ঞানকর্মীরা তাঁদেব শক্তি ক্ষয় করছেন তাহলে আমার মনে হয় জনসাধারণেব কাছ থেকে সহযোগিতা ও সাহায্য পাওয়া যাবে ও তাবফলে বিজ্ঞানের সেবা আরও ত্বরান্বিত হতে পারবে।

এই বক্তৃতায় যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়। এর ঠিক পরেই যুক্তপ্রদেশের বিজ্ঞানীদের এক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য হিসেবে সাহা এর নিয়মাবলী ও উদ্দেশ্য সমূহের খসড়া প্রণয়নে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নেন। এটি করা হয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের আদলে।

এইভাবে এলাহাবাদে 1930 সালে গঠিত হল ইউ পি আকাদেমী অফ সায়েন্স। অধ্যাপক সাহার অনুরোধে গভর্ণর এই আকাদেমীকে বছরে চার হাজার টাকার অনুদান দিতে স্বীকৃতও হলেন। সাহা আকাদেমীর প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

বিজ্ঞানের উন্নতি সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশের বিজ্ঞানীদের যে মতামত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত সাহা ক্রমে এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হচ্ছিলেন। এইজন্য সমস্ত বিজ্ঞান কর্মীদেব সংগঠিত করার দবকার অনুভব করছিলেন তিনি। তাই আকাদেমীব উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বগত ভাব বিনিময়ের চেয়েও কিছু বেশি। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রযোগে বিষয়েও আকাদেমীর ভূমিকা থাকবে এটাও ছিল এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রথম জাতীয সমস্যা সমাধানেব বিষয়ে কোন ভারতীয় বিজ্ঞানীকে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল। এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায সাহাব মনের গতি তখন কোন খাতে প্রবাহিত হতে সুরু করেছে। এটাই প্রথম পদক্ষেপ, তবে এর থেকে ঝোঁকটা স্পষ্ট বোঝা যায। সমাজকল্যাণে বিজ্ঞানেব ভূমিকা সম্পর্কে তখন তিনি কি ভাবছিলেন তা 1932 সালেব প্রেসিডেন্টেব অভিভাষণে পাওয়া যায়[26] ঃ

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই ধাবণা পোষণ কবেন যে আজকেব জগতের অনেক দুর্দশাব কারণ পবিবর্তিত সমযের সঙ্গে খাপ খাওযাতে না পাবা। যোগাযোগ ব্যবস্থাব দ্রুত প্রসার হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন দেশ পরস্পবের কাছাকাছি আসতে পাবছে। এইভাবে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দিক দিযে বিশ্ব একটি ব্যবস্থায পবিণত হচ্ছে। কিন্তু বাজনীতিবিদরা এখনও তাদেব উন্নাসিকতা পবিত্যাগ কবতে পাবছেন না।

আর্কিমিডিসেব সময, কিংবা আরও ভাল কবে বলতে গেলে নোমাব ও হেসযডেব সময পদার্থবিজ্ঞানীদের যা অবস্থা ছিল—গত মহাযুদ্ধেব আগে রাজনীতিজ্ঞদেব অবস্থাও ছিল সেইবকম। নিজেব দেশই তাব স্বর্গ, দেশবাসীরা দেবতা, অন্যেবা দৈত্য দানবেব সমতুল্য। তাবা অসভ্য, বর্বব — আক্রমণ কবে তাদেব বশ্যতা স্বীকাবে বাধ্য কবা ছাড়া অন্য কোন আচবণের অনুপযুক্ত। গত মহাযুদ্ধ এবং তার আগে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সবই এই মানসিকতা থেকে উৎপন্ন। তবে ভযাবহতায প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আগেব সব যুদ্ধকে ছাড়িযে যায, কাবণ বিজ্ঞান মানুষের হাতে অনেক বেশি ধ্বংসের ক্ষমতা দিয়েছিল। তবে এর কিছু সুফলও যে ছিল না তা নয। বোঝা গেল পবস্পবের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এখন কত অর্থহীন। প্রযাত শ্রী এম ক্লিমেনসো যখন মিশবে যান তখন পিরামিডগুলি দেখে তিনি কিছু মন্তব্য কবেন। ক্রীতদাসদেব দিয়ে পরিশ্রম করিযে ফারাওবা এই বিশাল পাথরের স্মৃতিমন্দিব তৈবী করায় তার মধ্যে তাদের আত্মা বসবাস করবে বলে (এই নিয়ে তিনি কিছু বিদ্রূপ করেন)। এব উত্তরে কায়রোর একটি সংবাদপত্র মন্তব্য করে, বিবাট পিরামিডের নির্মাতা চিত্তপনোর আত্মা গর্ভগৃহের বাইরে এসে সম্ভবত পাল্টা বিদ্রূপ করে বলতেই পারে ভার্সাই চুক্তিই কি কম অর্থহীন ? জাতীয়তাবাদের রক্তাক্ত বেদীমূলে কত তরুণের প্রাণ বলি দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধে যা খরচ হচ্ছে তার এক দশমাংশ খরচ করলে বিবদমান দেশগুলিতে যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আসবে তা রাজনীতিকদেব বিচিত্র পদ্ধতি থেকে কখনই আসতে পারে না।

কিছুদিনের মধ্যেই আকাদেমীর সদস্যপদ যুক্ত প্রদেশের আগ্রা ও অযোধ্যার ভৌগোলিক সীমার বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। 1934 সালে ইউ পি আকাদেমীর নাম বদলে করা হল ন্যাশনাল আকাদেমী অফ সায়েন্স। চার বছর পরে শক্তি সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আমন্ত্রিত হন। নেহরু বলেন, বিজ্ঞানীরা যেন বেশ সুষ্ঠভাবে লেখা প্রস্তাবের খসড়া সরকারের কাছে পাঠান। শক্তি উৎপাদনের বিষয়ে তাঁরা যেন নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, "আমাদের জনমত গড়ে তুলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।" 1980 সালে ন্যাশনাল আকাদেমীর সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রতিষ্ঠাতাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা হয়।

আকাদেমীর আঞ্চলিক চরিত্র সাহাকে ঠিক খুসী করতে পারছিল না। সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর মত আকাদেমীর কাজকর্ম ছিল অংশত স্থানীয় এবং অংশত সর্বভারতীয় । সম্পূর্ণ সর্বভারতীয় চরিত্র থাকবে এমন একটি সংস্থার কথা তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন। এই নিয়ে তিনি বোম্বাইয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের 21তম অধিবেশনে বলেন। তাঁর সভাপতির অভিভাষণ দু ভাগে বিভক্ত ছিল। সমস্যা নিয়ে তিনি প্রথম অংশে বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় ভাগে তিনি একটি ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। তাছাড়াও তাঁর প্রস্তাব ছিল একটি রিভার ফিজিক্স ল্যাবরেটরীর। তাঁর মতে, আকাদেমীর উদ্দেশ্য হবে এইরকম ঃ

> ইণ্ডিয়ান আকাদেমীর চরিত্র হবে একটি কেন্দ্রীয় সমিতির মত। বিজ্ঞানের সব বিভাগের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এখানে। উপমা দিতে গেলে বলা যায় ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি অথবা জার্মানীর প্রুশিয়ান আকাদেমীব মত এটি হবে পিবামিডের শীর্ষবিন্দু, তলায় থাকবে বিভিন্ন বিষয়ের সমিতি। সুতরাং এর সদস্য সংখ্যা সীমিত হতে হবে। এব সদস্যপদ খুবই সম্মানজনক বলে গণ্য হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই আকাদেমীর যোগ থাকবে।
>
> এইভাবে গঠিত হলে নিম্নলিখিত কাজগুলি আকাদেমীর পক্ষে করা সম্ভব ঃ
>
> 1. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আকাদেমী অফ সায়েন্সের মত এই আকাদেমী প্রসিডিংস প্রকাশ করবে। সংক্ষিপ্তসারের আকারে কেবলমাত্র গবেষণার ফল থাকবে এতে। কোন বিশেষ বিষয়ে জার্ণাল প্রকাশ করা হবে না। সেগুলির ভার অন্য সমিতির উপর থাকবে। তবে আকাদেমী স্মৃতিকথা বা কার্যবিবরণী ছাপতে পারে।
> 2. আকাদেমী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সংগঠন অধিগ্রহণ করবে।
> 3. জাতীয় গবেষণা কমিটি গঠনের জন্য আকাদেমী সরকারকে অনুরোধ করবে। এই কমিটিতে আকাদেমীর উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

4. বিজ্ঞান গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে।
5. বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য, সরকারী ও বেসরকারী স্তরে গবেষণায় যোগসূত্র রেখে চলবে।
6. জাতীয় কল্যাণমূলক সমস্যায় উদ্যোগ নেবে ও উৎসাহ দেবে।
7. আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যাপারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে।

অধ্যাপক সাহার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনেই একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। জিওলজিকাল সার্ভের ডিরেক্টর স্যার এল এল ফার্মার চেয়ারম্যান হন এবং সংগঠন সম্পাদক হন যথাক্রমে অধ্যাপক সাহা ও এস পি আঘারকর। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বভারতীয় আকাদেমীর প্রতিষ্ঠা নিয়ে কিন্তু প্রচণ্ড বিতর্ক সুরু হয়। এলাহাবাদের ন্যাশনাল আকাদেমী ছাড়াও ইতিমধ্যে স্যার সি ভি রমন বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান আকাদেমী অফ সায়েন্স গঠন করেছেন। শেষ অবধি সাহার প্রস্তাবিত আকাদেমী গঠিত হল। নাম হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস, ইণ্ডিয়া। এটি সর্বোচ্চ সমন্বয়কারী আকাদেমী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হল। স্যার এল এল ফার্মার হলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট। অধ্যাপক সাহা হলেন অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট। ফার্মার নিজেও ছিলেন বিজ্ঞানী। 1965 সালে উদ্বোধনী ভাষণে তাঁর মতামতের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

> দার্শনিকরা মিলিত হয়ে আলোচনা করতে পারবেন এই ধারনা থেকে প্রথম আকাদেমীর জন্ম হয়। প্রকৃতি অনুযায়ী এটি ব্যক্তিগত সংযোগের জায়গা এবং এর চরিত্র স্থানীয়। সেইদিক থেকে বিচার করতে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও দ্রুত ও সুলভ না হওয়া অবধি ভারতের মত বিস্তৃত দেশে এই জাতীয় আকাদেমী স্থাপনের প্রচেষ্টা অর্থহীন। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে গবেষণার কাজ হতে থাকলে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভিত্তিতে আলাদা আলাদা আকাদেমী গড়ে উঠতে পারে। এত বড় দেশে কতগুলি আকাদেমী হবে তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের এখন ঠিক করতে হবে তাঁরা নিজেদের আঞ্চলিক উদ্যানগুলিতে পায়চারী করে আলোচনা করতে পছন্দ করবেন, না দূর দূরান্তের বাগানের সঙ্গে ছাপার অক্ষর ও ডাকবাক্সের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করবেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সেরকম প্রচেষ্টার পক্ষে সময়টা তখন অনুকূল। দ্রুত যোগাযোগ পদ্ধতি সবে সুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ছাপার সময় আর ডাকবাক্সের দিকে আগ্রহী হচ্ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসে যে আকাদেমীর বাগানে প্লেটো তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন সেদিন বহুকাল গত। আকাদেমীর চরিত্রও বদলেছে। 1937-39 সালের জন্য সাহা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

সুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনিক দিক সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। তাছাড়া গবেষণাপত্র প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁর উদ্যম ছিল অক্লান্ত। বর্তমানে এর নাম বদলে হয়েছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স আকাদেমী।

এলাহাবাদে চলে আসা সত্ত্বেও সাহা কলকাতায় কি ঘটছে না ঘটছে তার খবর রাখতেন। সেখানে দেশের প্রাচীনতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফব দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্সে তখন ঘোর সংকট চলেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে কাজ করেই সি ভি রামন নোবেল পুরস্কার পান। 1907 সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নোবেল পুরষ্কার আসে 1930 সালে। তবে কালক্রমে প্রতিষ্ঠানের চালনার ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অন্যতম ট্রাস্টি। মহান ব্যক্তিদের এই বিরোধে অবশেষে রামনকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ইতিমধ্যে শ্যামাপ্রসাদ সাহার সহযোগিতার জন্য এলাহাবাদে এসেছিলেন।

বিজ্ঞান জগতে সাহা ক্রমেই খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন। তার অনেকগুলি কারণও ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে রামনই একমাত্র নোবেল পুরষ্কারে সম্মানিত হন একথা ঠিক, কিন্তু সাহা বিশের দশকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি আর্জন করেছেন। সাহার নাম নোবেল কমিটিতে প্রস্তাবিত হয় কিন্তু তখন জ্যোতিষ পদার্থবিজ্ঞানে এই পুরস্কার দেওয়া হত না। তাছাড়া এলাহাবাদে তাঁর হাতে গড়া ছাত্র ও গবেষকরা তাঁকে বাড়তি শক্তি দিয়েছিল। তাঁর সুযোগ্য ছাত্রেরা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। তৃতীয় কারণ হল, দেশের উন্নতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় আস্থা। তিনি ভাসা ভাসা চিন্তার মানুষ ছিলেন না । পরিকল্পনার খসড়া করে তাকে কাজে পরিণত না করা অবধি তিনি স্থির থাকতে পারতেন না।

সাহার সংগঠনের ক্ষেত্র ক্রমে আরও প্রসারিত হচ্ছিল। তাঁব পরবর্তী কাজ হল, কলকাতায় বিজ্ঞান সংবাদ সংস্থা অথবা সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা ও তার মুখপাত্র হিসেবে সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার পত্রিকার প্রকাশ । এই পত্রিকা ইংলণ্ডের জনপ্রিয় নেচার পত্রিকার আদলে রচিত হয় । প্রথম সংখ্যা থেকে জীবনের শেষদিন অবধি সাহা এই পত্রিকায় তাঁর বহু গঠণমূলক মতামত প্রকাশ করে গেছেন – সম্পাদকীয়, স্বাক্ষরিত অথবা অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধে । পরিশিষ্টে এগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয়েছে ।

1936 সালে কার্নেগী ট্রাস্টের একটি ফেলোশিপ পেয়ে সাহা ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন ল্যাবরেটরী দেখার এক দীর্ঘ সফরসূচি নেন । ফলে কিছুদিনের জন্য পড়ানোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল । সেইসঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলিতে কি ঘটছে তারও একটা ধারণা তিনি করতে পারলেন । জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিতকে তিনি

সঙ্গে নেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে একটি স্কুলে ভর্তি করে দেন । ফেরার পথে তাঁরা বসরা পর্যন্ত জাহাজে এসে স্থলপথে যান বাগদাদ, বেরুট ও হাইফা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার কয়েকবছর পরে সুরু হয় । তখন আবহাওয়া নাজি–অত্যাচারে ভারী হয়ে আছে । ত্রিয়েস্ট যাবার সময় জাহাজে কিছু ইহুদীদের দেখা গিয়েছিল ।

মিউনিখে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সম্ভাবনা কি বিপুল। প্রায় রোজই কোন না কোন রোমাঞ্চকর তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে । এক ল্যাবরেটরীব দবজায় কেউ ঠাট্টা করে একটি নোটিস টাঙিয়েছিল ঃ "সাবধান । এখানে বস্তু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে আবার নতুন করে তৈরী করা হচ্ছে।" একমাস অক্সফোর্ডে কাটাবার পব সাহা ম্যাসাচুসেটসের কেমব্রিজে হার্ভার্ড কলেজ ল্যাবরেটরীতে যান । সেখানে তখন ডিরেক্টর ছিলেন তার বিশিষ্ট বন্ধু ডঃ হ্যারল্ড শ্যাপলে । সেখানে থাকা অবস্থায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । তিনি ভবিষ্যদ্ববাণী করেন যে যদি আবহমণ্ডলের ওজোন স্তরের উপরে উঠে সৌর বর্ণালী পরীক্ষা করা যায়, তবে তার মধ্যে হাইড্রোজেনের লাইম্যান লাইন দেখা যাবে। 18 বছর পরে ভি টু রকেটের সাহায্যে এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছিল । আজকাল এটি খুবই সাধারণ এক্সপেরিমেণ্ট । যুক্তরাষ্ট্রে তিনি বিভিন্ন ল্যাবরেটরী পরিদর্শন কবেন। তার মধ্যে ছিল বার্কলের সাইক্লোট্রন । এখানে ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ই ও লরেন্স। আমরিকা যাবার আগে তিনি কোপেনহেগেনে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন । এর ঠিক দু-বছর পরেই বিভাজন আবিষ্কার হয়।

1938 সালে কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী হল। এতে কথা ছিল লর্ড রাদারফোর্ড সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু তার মাত্র কয়েকমাস আগেই তিনি মারা যান । বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটনও এতে যোগ দেন। সাহাব বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি এলাহাবাদে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হন।

সাহার ইচ্ছে ছিল এলাহাবাদেই স্থায়ীভাবে বাস করবেন। সেখানে তাঁর বাড়ীটিও ছিল বেশ বড় । উত্তর প্রদেশের সর্বত্র এবং বিশেষ করে এলাহাবাদে তিনি খুবই সম্মান পেতেন । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ক্রমে এমন মোড় নিল যে তাঁর পক্ষে মর্যাদা সহকারে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল । তখন তিনি অন্যত্র যাবার কথা ভাবতে লাগলেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের কথায় ঃ 'সাহা ছিলেন স্বাধীনচেতা ও সাহসী মানুষ । কিছুদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম যেভাবে চলছিল তা তিনি অনুমোদন করতে পারছিলেন না । অবস্থার উন্নতির কোন আশা নেই দেখে তিনি পদত্যাগ করে এলাহাবাদ ছাড়লেন । তাঁর বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ তাঁর কলকাতায় ফেরার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।"

সাহার কাছে দুটি প্রস্তাব এসেছিল – একটি কলকাতার পালিত অধ্যাপকপদ, অন্যটি বথের রয়াল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধ্যক্ষ পদ । তিনি প্রথমটি বেছে নিলেন। এখানে সাহার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনে একটি মিল দেখা যায় । দুজনকেই স্যার আশুতোষ বেছে নেন, কিন্তু প্রায় একই সময়ে দুজনে কলকাতা ছাড়েন। অবশেষে দুজনেই ফিরলেন – সাহা 1918 সালে এবং বসু 1946-এ । বৃত্ত সম্পূর্ণ হল ।

পাঁচ

ঘরে ফেরা ও নতুন প্রতিষ্ঠানের সূচনা

1938 সালে জুলাই মাসে সাহা পালিত অধ্যাপক ও ফিজিক্সের বিভাগীয় প্রধান হয়ে কলকাতা ফিরলেন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যপট তখন অনেক বদলে গেছে। স্যার আশুতোষ মারা গেছেন, রামন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন ভাইস চান্সেলার, তবে তাঁরও কার্যকাল প্রায় শেষ । তাঁর পরে এই পদে এলেন স্যার মোহম্মদ আজিজুল হক । রামনের প্রস্থান ও সাহার আগমনের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় দেবেন্দ্রমোহন বসু পালিত অধ্যাপক হয়েছিলেন। ফিজিক্স বিভাগে তখন ঘোষ অধ্যাপক ছিলন শিশির কুমার মিত্র, খয়রা অধ্যাপক ছিলেন বি বি রায়। চারজন লেকচারার ছিলেন – সুশীলকুমার আচার্য, যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সাহার সহপাঠী ও প্রথম জীবনের সহকর্মীরা ততদিনে অন্যান্য বিভাগের অধ্যক্ষতা করছেন বা নামী অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁদের নামের তালিকা হল এইরকম ঃ ফলিত গণিতে ঘোষ অধ্যাপক ও প্রধান এন আর সেন, রসায়নে পালিত অধ্যাপক ও প্রধান পি সি মিত্র, ঘোষ অধ্যাপক জে. এন. মুখোপাধ্যায়, খয়রা অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে ঘোষ অধ্যাপক পি এন ঘোষ, ফলিত রসায়নে ঘোষ অধ্যাপক বি সি গুহ, মনোবিজ্ঞানে গিরীন্দ্রশেখর বসু, উদ্ভিদবিদ্যায় ঘোষ অধ্যাপক এস পি আঘরকার এবং প্রাণীবিদ্যায় হিমাদ্রী শেখর মুখোপাধ্যায় । কলা বিভাগগুলিতেও অনেক গুণীব্যক্তি ছিলেন । এলাহাবাদের তুলনায় কলকাতার বুদ্ধিজীবি সমাজ ছিল বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময়। কাজ করার ভিত্তিভূমি এর ফলে সাহার পক্ষে অনুকূল ও প্রশস্ততর হল । ইতিমধ্যেই তিনি জাতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন । প্রায়ই গবেষণা ছেড়ে ওখানে যাবার ডাক আসত । কলকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা কমিটির কাজে জড়িয়ে পড়েন । তা সত্ত্বেও তিনি পালিত ল্যাবরেটরীতে গবেষণার সংগঠনকে উপেক্ষা না করে এদিকে মনোযোগী হলেন ।

তাঁর প্রথম কাজ হল এম.এস.সি সিলেবাসটি ঢেলে সাজানো। এটা অবশ্য হয়েছে ধাপে ধাপে। তিনি যতদিন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ততদিন কোন না কোনভাবে পাঠক্রমের অদল বদল ঘটানো হয়েছে । 1939 সালে পরমাণু বিভাজনের পরের বছর

তিনি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে একটি বিশেষ পেপার চালু করেন । কোয়ান্টাম মেকানিকসেও আলাদা পেপার যুক্ত হয় ।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা যুক্ত থাকার ফলে সমন্বয় সাধন সবসময় সহজ ছিল না । সাহার বন্ধু স্নেহময় দত্ত ছিলেন ঐ কলেজের ফিজিক্স বিভাগের প্রধান । তাঁর সহযোগিতা নিয়ে সাহাকে কখনই চিন্তা করতে হয়নি।

তারপর তিনি মন দিলেন ল্যাবরেটরীর সংস্কারে । দুটি ঘরে ছিল এই গবেষণাগার। রামনের স্পেকটোগ্রাফ এখানেই থাকত । পালিত ট্রাস্টের টাকায় কেনা এই যন্ত্রগুলি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে সাহার ব্যক্তিগত কোন আগ্রহ না থাকলে যন্ত্রগুলি উপযোগী করার জন্য তিনি সুকুমার চন্দ্র সরকারকে একাই কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন । সরকার তখন ছিলেন পালিত অধ্যাপকের রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট। পরে ইনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক হন এবং রামন প্রভাব নিয়ে কাজ চালাতে থাকেন ।

ডি এম বসুর গবেষণার বিষয় ছিল পরমাণু বিজ্ঞান (অ্যাটোমিক ফিজিক্স) ও চুম্বক তত্ত্ব । বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর হয়ে চলে যাবার সময় তিনি প্রায় সব যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে যান । এইদিকে কাজ চালিয়ে যেতে সাহার খুব আগ্রহ ছিল না । এলাহাবাদে তিনি আয়নমণ্ডল ও উচ্চ আবহমণ্ডল নিয়ে যে গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন কলকাতায় শিশির মিত্র সেই কাজই করছিলেন । ইতিমধ্যেই তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং সুযোগ্য গবেষক গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছেন । সাহা তাই এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে চাইলেন না । এদিকে খয়রা ল্যাবরেটরীতে বি বি রায় এক্স-রে স্পেকট্রোস্কপিতে গবেষণা করে পরিচিত হয়েছেন । সাহা এই বিষয় নিয়েও এলাহাবাদে গবেষণার সূত্রপাত করেন । 1927 সালে এই বিষয়ে রায় ও সাহার যুক্ত পেপারও প্রকাশিত হয় । বি বি রায় এইদিকেই মনোযোগ দিলেন । অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সে কেউ কাজ করছিলেন না ।

সাহা অবশেষে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সকেই বেছে নিলেন । তারকা দেহের আয়নীভবন থেকে পরমাণুর অন্তঃস্থল – এ এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা নিশ্চয়ই । ইউরোপ ও মার্কিন দেশ ভ্রমণের সময় সাহা প্রথম এই নতুন বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হন । অমিত শক্তিশালী পরমাণুর রহস্য উদঘাটন করে তখন পশ্চিমের বিজ্ঞানীমহল সচকিত হয়ে উঠেছেন। হান ও স্ট্রাসম্যান 1939 সালে আবিষ্কার করেছেন বিভাজন । ছাত্রদের এই নতুন বিষয়ের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য সাহা সঙ্গে সঙ্গে এটি এম.এস.সি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন । তাছাড়া মার্কিন দেশের বার্কলেতে লরেন্সের রেডিয়েশন ল্যাবরেটরীও দেখে এসেছিলেন তিনি – এখানে পরমাণু কণা ত্বরান্বিত করার

জন্য অ্যাকসেলারেটর ব্যবহার করা হচ্ছিল । এইসব পরীক্ষা কিন্তু প্রচণ্ড ব্যয় সাপেক্ষ। কম খরচে গবেষণা চালাবার দিন শেষ হয়েছে । সাহা সে কথা বুঝলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষদের কিভাবে বোঝানো যায়? আগে রিসার্চ গ্রান্ট আসত হাজার টাকার স্তরে – এখন তা লক্ষের স্তরে পৌঁছে গেছে। সুতরাং জগদীশচন্দ্রের মত ছোট ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরী এখন আর চলতে পারে না (যন্ত্রপাতি তখন অবিশ্বাস্য রকম দামী)।

কিন্তু কাদের নিয়ে কাজ সুরু হবে? রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট ডঃ এস সি সরকার অবশ্য ছিলেন । আর ছিলেন সদ্য ইংলণ্ড প্রত্যাগত ডঃ এন এন দাশগুপ্ত । তাছাড়া অনতিবিলম্বে কাজ সুরু করার মত গুটি কয় গবেষক ছাত্র । যেমন কমলেশ রায় ও পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে কাজের জন্য যা দরকার তা নিজেরাই তৈরি করে নিল। আর কিছু গাইগার কাউন্টার । তারপর সদ্য পাশ করা এম.এস সি ছাত্ররাও এসে জুটলেন। মন্দ আরম্ভ হল না । কিন্তু সাহা এই উদ্যমকে এত ছোট আকারে আবদ্ধ রাখতে চাননি। বার্কলেতে যেরকম সাইক্লোট্রন দেখে এসেছেন সেরকম পারমাণবিক সরঞ্জাম অর্থাৎ একটি সাইক্লোট্রন স্থাপনের জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর। এইভাবে পবমাণু গবেষণার কেন্দ্র গড়ে উঠুক – এই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়।

কিন্তু সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি স্থাপন ও চালানোর খরচ যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামর্থ্যের বাইরে। তাছাড়া তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। বড় প্রকল্পে হাত দেওয়ার পক্ষে রাজনৈতিক আবহাওয়াও তেমন অনুকূল নয়। 1939 থেকে 1941 এর মধ্যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মিটিং-এর সূত্রে সাহার প্রায়ই পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে দেখা হত। নিউক্লিয়ার এনার্জির যে অফুরন্ত সম্ভাবনা এ বিষয়ে তিনি সহজেই নেহরুকে বোঝাতে পারেন। দেশের ভবিষ্যত শিল্পায়নের জন্য যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দরকার নেহরুর তা ছিল। ইতিমধ্যে বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছেন সাহা । কাজেই তাঁর মতামত অবজ্ঞা করা সহজ ছিল না। সাইক্লোট্রন ল্যাবরেটরীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হল । নেহরুর অনুরোধে এ টাকা দিলেন টাটা ট্রাস্ট । 1940 সালে বোম্বাইয়ের মেসার্স টাটা অ্যাণ্ড সনস্ এর কাছ থেকে পাওয়া ষাট হাজার টাকায় কাজ সুরু হল । সাইক্লোট্রনের কিছু যন্ত্রাংশ কেনার জন্য অর্ডারও দেওয়া হল । সাইক্লোট্রনের উদ্ভাবক আর্নেস্ট লরেন্সের কাছে তখন কাজ করছেন বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরী। যন্ত্রাংশগুলি কেনার ভার তাঁকেই দেওয়া হল। 1941 সালের অক্টোবরে ফিরে এলেন নাগচৌধুরী এবং সাইক্লোট্রন অফিসার হিসেবে যোগ দিলেন। এদিকে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে ভ্যাকুয়াম পাম্প সহ একটি জরুরী যন্ত্রাংশ ভারতে পৌঁছুতে পারল না। সাহা তখন এখানেই পাম্পগুলি তৈরী করার জন্য অর্থ চেয়ে সি এস আই আরকে একটি পরিকল্পনা দেন। বিজ্ঞান কলেজের ওয়ার্কশপে ডিফিউশন ও মেকানিকাল পাম্প তৈরী হল। এটি করার কৃতিত্ব কমলেশ রায়ের কিন্তু দুঃখের

বিষয় বড় সাইক্লোট্রন চেম্বারের পক্ষে পাম্পগুলি একটু ছোট হয়ে গেল । এইভাবে সুরু থেকেই নানা বাধা বিপত্তি দেখা দিতে লাগল।

রাজনৈতিক আকাশে 1942 সাল থেকেই দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল । সুভাষচন্দ্র বসু জাপান ও জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন । মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে দেশবাসী উদ্বুদ্ধ । এর প্রভাব ছাত্র ও গবেষকদের উপর পড়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল বৃটিশ রাজত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে। চেষ্টা চলছিল যাতে যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর উন্নয়নমূলক কাজে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাহায্য পাওয়া যায়।

এই উদ্দেশে রয়্যাল সোসাইটির সেক্রেটারী অধ্যাপক এ ভি হিল ভারতে এসে সব নামী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করলেন । তাঁরই চেষ্টায় পাঁচ মাসের জন্য একটি শুভেচ্ছা সফরের আয়োজন করা হয়। এতে যোগ দেন নাজির আহমদ, এস এল ভাটিয়া, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ ও জে এন মুখার্জি । এই দলের নেতৃত্ব দেন শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন গবেষণাগার এঁরা দেখতে যান।

তখনও হিরোশিমা ও নাগাসাকির নাম পৃথিবীতে অজানাই ছিল, কারণ সেই বোমা তখন তৈরী হয় নি । যখন সাহা ও অন্য বিজ্ঞানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছন তখন কিন্তু নিশ্ছিদ্র সতর্কতার মধ্যে এই বোমা নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে । তখন 1944 সালের অক্টোবর। ম্যানহাটা প্রজেক্ট চলছে খুবই গোপনভাবে, পরমাণু শক্তি নিয়ে কাউকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না । সাহা এসব ঘটনার বিন্দুবিসর্গ না জেনে পরমাণু নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি জাতীয় গবেষণা চলছে সে ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এফ বি আই (ফেডারাল বুরো অফ ইনভেস্টিগেশনস) সাবধান হয়ে উঠল এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নজরে নজরে রাখল। ইংলণ্ডে বৃটিশ বিজ্ঞানীদের কাছে সাহা বিজ্ঞানে সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তৃতা করেন। বার্কলেতে গিয়ে তিনি লরেন্সের সঙ্গে দেখা করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের বড় বড় ল্যাবরেটরীগুলিও ঘুরে দেখেন।

তারপর হল পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ । এর ফলে যুদ্ধ থেমে গেল, তবে সেই সঙ্গে পরমাণু গবেষণার আবহাওয়া রাতারাতি পালটেও গেল । যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য ইউরোপ থেকে অনেক বিজ্ঞানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে বিপুল সরকারী অর্থ সাহায্য ও সমন্বয়ের ফলে পরমাণু শক্তির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হল । যদিও মৌলিক আবিষ্কারগুলি হয়েছিল ইউরোপে কিন্তু ঘটনাচক্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা এগিয়ে গেল । বোমার পরে তারা চেইন রিঅ্যাকশনের সাহায্যে এই শক্তির নিয়ন্ত্রিত উপযোগের দিকে নজর দিল যাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় । কিন্তু অন্যদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার দরুন যুক্তরাষ্ট্র পারমানবিক গবেষণার ব্যাপারে তাদের ফলাফল অন্য দেশকে জানাতে চাইল না।

সাহা পড়লেন বিপদে । তবে তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না । তিনি দেখলেন নিউক্লিয়ার গবেষণার জন্য একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান দরকার । তখনকার বাংলা সরকার সাহায্যের বদলে কেবল বাধাই সৃষ্টি করতে লাগলেন । তবে অন্যত্র থেকে সাহায্য আসতে লাগল –কানাডা থেকে রেডিয়াম কেনার জন্য, রণদা প্রসাদ সাহা দিলেন 45 হাজার টাকা। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের জন্য ডঃ বি সি লাহা দিলেন 17 হাজার টাকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিমধ্যেই 60 হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল। 1943 সালে জি ডি বিড়লা 12 হাজার টাকা দেবার কথা স্বীকার করেন। পাঁচবছর অবধি টাটা ও বিড়লার অনুদান দেওয়া হবে বলা হল।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে এর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু খয়রা অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়ে বিভাগে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছেন । কয়েকবছর আগে বি বি রায়ের অকাল মৃত্যুর পর থেকে এই অধ্যাপক পদটি শূন্য পড়ে ছিল ।

নেহরুর নেতৃত্বে নতুন জাতীয় সরকার গঠিত হল । অবশেষে সাহার অভিলাষ পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিল । তবে এখন মনে হয় তিনি যে সাহায্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা বড়ই অল্প । যাই হোক, কোনভাবে আরম্ভ করে দেওয়া সমীচিন বিবেচনা করে 1948 সালের 21 এপ্রিল ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পত্তন হল ।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তখন দিল্লীতে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী । তিনি বরাবরই সাহাকে এই উদ্যোগে সাহায্য করে এসেছেন । সুতরাং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি । তখনকার উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ইনিও অর্থসংগ্রহে সাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন । আগেই তিনি সুর ট্রাস্ট থেকে দুই লাখ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন । কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন 3.5 লাখ টাকার অনুদান। পরে আণবিক শক্তি কমিশন দেন 1.2 লাখ টাকা । এই সব ঋণ ও অনুদানের টাকায় অবশেষে তিনতলা বাড়ি তৈরী হল । তিন হাজার বর্গ মিটার জায়গা পাওয়া গেল ল্যাবরেটরি ও অফিসের জন্য ।

1950 সালের 11 জানুয়ারী ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রেডিয়ম আবিষ্কারকের কন্যা নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী আইরিন জোলিও কুরী । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফ্রেডারিক জোলিও, রবার্ট রবিনসন, জে ডি বার্নেল, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, উপাচার্য ও আরও অনেকে । উল্লেখ করার বিষয় হল এই উদ্বোধন কোন রাজনীতিকের বদলে এমন একজন বিজ্ঞানী করলেন যাঁর সঙ্গে সাহার মতের মিল ছিল। এঁরা দুজনেই মনে করতেন সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের একটা দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে।

প্রায় একই সময়ে 1948 সালে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন অ্যাক্ট পাশ হল, যার

বলে গঠিত হল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন । এর চেয়ারম্যান হলেন হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা । সদস্য ছিলেন শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর, কে. এস. কৃষ্ণন ।

স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনস্টিটিউটকে দাঁড় করাবার জন্য সাহা এবার উঠে পড়ে লাগলেন। ব্যক্তিগত দান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামর্থে যে আর চলা সম্ভব নয় তা তিনি ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন । গবেষণার আকার ও আয়তন ক্রমে বিশাল হয়ে উঠছিল । সরকার ছাড়া এসব বৃহদাকার প্রকল্পে অর্থসাহায্য কে করতে পারবে ? তখনকার দিনে ইনস্টিটিউটের সব কাজকর্ম চলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে । 1951 সালের 12 মে সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সভায় ঠিক হল, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব সংবিধান ও গভর্ণিং বডি থাকবে। স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করবে। তবে টাকা আসবে প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ অনুদান নামমাত্র হলেও উপাচার্য হবেন পদাধিকার বলে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান । প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন । এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে উপাচার্যের পত্রালাপ হত। সিনেটে 1951 সালের বক্তৃতা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । নেহরুর চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল[32] :

> বৈজ্ঞানিক মেধা ও অন্যান্য ব্যাপারে আমাদের সম্পদ এখনো সীমিত যদিও আশা করি তা বাড়বে । সুতরাং যা আছে তার উপযুক্ত ব্যবহার করা দরকার । তার জন্য চাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমণ্বয় । এই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বভারতীয় চেহারা দেবার জন্য আমাদের তরফ থেকে কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয় । তবে দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে সম্পূর্নই ডিরেক্টর ও গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর উপর। তবে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সর্বভারতীয় চরিত্র থাকলে মনে হয় এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবং ভারতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে ।
>
> ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স খুব ভাল এবং জরুরী কাজ করছে । সুতরাং ভারত সরকারের তরফ থেকে বলা যায় যে সরকারের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটা সম্ভব অর্থ অনুদান এদের দেওয়া সমীচিন।

আরেকটি চিঠিতে নেহরু বলছেন :

> আপনার ৩রা এপ্রিলের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম । এই চিঠিতে ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গভর্ণিং বডি গঠনের তোড়জোড় হচ্ছে শুনে এবং 1952 সালের জুলাই থেকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি কাজ সুরু করবে জেনেও আনন্দিত হলাম ।

গভর্ণিং বডির প্রথম মিটিং হয় 1951 সালের 22 জুন । স্টুডেন্টস হলের ভিত্তি

স্থাপন উপলক্ষে সাহা[33] বলেন, তিনি আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ বিস্তৃত করতে চান । এগুলি হল ঃ (i) পার্টিক্‌ল অ্যাকসেলারেটর, (ii) নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, (iii) ইনস্ট্রুমেন্টেশন, (iv) নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি (v) থিওরেটিকাল নিউক্লিয়ার সায়েন্স, (vi) নিউট্রন ফিজিক্স (vii) পোস্ট এম.এস সি শিক্ষণ বিভাগ । এই কম সময়ের মধ্যে ছাত্র ও কর্মীদের ভাল কাজের জন্য তিনি প্রশংসা করেন।

পোস্ট এম.এস সি পাঠক্রম এখন কিছু নতুন ব্যাপার নয় । তবে সাহাই প্রথম তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থাটির সূচনা করেন । এক বছরের এই কোর্সটির উদ্দেশ্য ছিল ঃ (1) ছাত্রদের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের যে কোন শাখায় ডক্টরেট করার জন্য তালিম দেওয়া, (2) সরকারের অ্যাটমিক এনার্জি দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরীর জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা, (3) বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিকাল প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের তৈরী করা এবং (4) মেডিসিন, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ইত্যাদি বিষয়ে নিউক্লিয়ার সায়েন্সের প্রয়োগ শেখানো । কুড়ি জন ছাত্র নেওয়া হত, তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সংরক্ষিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাইরের ছাত্রদের জন্য ।

শীঘ্রই এই কোর্সটি হয়ে দাঁড়াল সারা ভারতের পোস্ট গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান ছাত্রদের মিলনক্ষেত্র । তাছাড়া এই কোর্স প্রতিষ্ঠানকে একটা সর্বভারতীয় চরিত্র দিল যা আগে ছিল না । এখন এইসব ছাত্ররা দেশে এবং বিদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যায় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ছিলেন পোস্ট এম.এস.সি কোর্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র । পদাধিকার বলে তিনি গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। কলকাতায় সাহার গবেষণামূলক কাজকর্ম বিষয়ে কোঠারীর মন্তব্যে আন্দাজ পাওয়া যায়[34] ।

সাহা কলকাতায় আসার পর গবেষণা করেন প্রধানত অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস নিয়ে, বিশেষ করে বিটা-অ্যাকটিভিটি, আয়নমণ্ডলে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিস্তারণ, এবং সৌর কীরিটের সমস্যা । সৌর কীরিটের একটা ব্যাপার দুর্জ্ঞেয় ছিল। বি. এডলীন (1938) দেখিয়েছেন 9 থেকে 13টি করে ইলেকট্রন হারানো অর্থাৎ খুব বেশি রকম আয়নিত হচ্ছে। তাছাড়া কিরীটের ভিতরের স্তরে নিকেলের উপস্থিতি । উজ্জ্বল বর্ণালী রেখা বিষয়ে এডলীনের এই কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য । সাহার সঙ্গে এই নিয়ে কাজ করেছেন ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু । তিনি দেখিয়েছেন, সম্ভবত উচ্চ আয়নিত কোবাল্ট পরমাণুর ফলেই কয়েকটি লাইনের এই তীব্র আয়নন এবং বাইরের কিরীটের বিক্ষিপ্ত বিকিরণে ফ্রাউনহফার লাইনগুলি চওড়া হয়ে যাওয়ার কারণ তখনও অজানা । তাছাড়া আরও রহস্য ছিল। কয়েক মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে খুব তীব্র বেতার বিকিরণের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে । এ সবের অর্থ কিরীটের তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রী, অর্থাৎ নক্ষত্রদেহের ভিতরের মত । কিন্তু এই তাপের উৎস কি ? সাহা কিন্তু এত উচ্চ

তাপমাত্রা থাকা ঠিক স্বীকার করতে পারছিলেন না। এমনকি এডলীন লাইনগুলির ব্যাখা করতে গিয়ে তিনি এক আশ্চর্য মতবাদও প্রকাশ করেন। তা হল উচ্চ আহিত আয়নগুলি আসছে পারমাণবিক বিভাজন থেকে। এই বিভাজন ঘটছে সূর্যের বাইরের মণ্ডলে । সাহা মনে করেন, ইউরেনিয়ম বা থোরিয়ম কেন্দ্রকগুলি বিভাজিত তিন বা চার টুকরো হচ্ছে। সূর্য ও অন্য নক্ষত্র দেহ থেকে বেতার তরঙ্গের বিকিরণ নিয়েও তিনি চিন্তা করেন। হাইড্রোজেন পরমাণুর সর্বনিম্নস্তর একাধিক অতিসূক্ষ্ম স্তরে বিভক্ত হওয়ার কারণ হিসেবে চৌম্বক ক্ষেত্রের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন (নেচার 158, 717, 1946)। অন্তত রেডিও বর্ণালীতে 21 সেমি উৎসারণ রেখা থাকার সম্ভাবনা পবিষ্কারভাবে চিনতে পারেন নি। তখন উনি এইচ সি ভ্যান ডে হুল্স্ট (1944)-এর অনুমান (prediction) সম্পর্কে জানতেন না। পালিত অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরীর সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি কিছু ভারতীয় প্রস্তাবের ভূতাত্ত্বিক বয়স নির্ণয়ের চেষ্টাও করেন। এই সময় অ্যাটমিক কলিশন বিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি করেন ছাত্র দেবীদাস বসুর সঙ্গে। প্রবন্ধটির নাম 'গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় পজিটিভ আয়নে ইলেকট্রন আটকে যাওয়া।' 1945 সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি অনেকবার উল্লেখিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের স্থাপন উপলক্ষে যে পুস্তিকাটি বেরোয় তাতে 1940 থেকে 1948 এই সময়ের মধ্যে 70 টি রিসার্চ পেপারের উল্লেখ ছিল । এই সময় সাহার সিনিয়র সহকর্মী ছিলেন সুকুমার চন্দ্র সরকার, নিরোজনাথ দাশগুপ্ত ও বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরী । নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে কর্মরত ছাত্র ও গবেষক ছিলেন কে সি মুখার্জি, পি কে সেনচৌধুরী, অজিত কুমার সাহা, অম্বুজ মুখার্জি, বি সি পুরকায়স্থ, এস এন ঘোষাল, সুকুমার বিশ্বাস, সুনীল কুমার সেন ও এই গ্রন্থের লেখক । কসমিক রে নিয়ে কাজ করছিলেন পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুবোধ কুমার ঘোষ, প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য এবং রণজিত কুমার দাস । ইনস্ট্রুমেন্টেশনে ছিলেন বিন্দু মাধব ব্যানার্জী ও রবীন্দ্র নাথ রায়। সাধারণ ফিজিক্সে ছিলেন কে সি নিয়োগী, জে আর বসুমল্লিক, এন ডি সেনগুপ্ত ও কমলেশ রায় । রামন প্রভাব নিয়ে কাজ করছিলেন ভুবন মোহন বিশুই । এক্স-রে তে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সাহা ও সুশীল কুমার চৌধুরী । সৌর পদার্থবিদ্যায় ছিলেন ডি এন কুণ্ডু, উচ্চতর আবহমণ্ডলে ছিলেন বি কে ব্যানার্জী ও ইউ সি গুহ । মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে সাহার কৌতুহল থেকে বেশ কিছু ভাল ফলাফল পাওয়া যায় । তার মধ্যে আছে কলকাতা ও দার্জিলিঙে কসমিক রশ্মির তীব্রতা মেপে (নিউ) মেসনের আয়ু নির্ধারণ। তবে কিছু দিন পরে কসমিক রে নিয়ে কাজ বন্ধ হয়ে যায় ।

1955 সালে প্রকাশিত পুস্তিকাতে পরবর্তী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা আলোচিত হয় । তাছাড়া 1949 সাল থেকে 1955 সালের মধ্যে প্রকাশিত 52টি গবেষণা প্রবন্ধের তালিকাও এতে দেওয়া হয় । এতে ছিল নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি, আয়নমণ্ডলের মধ্যে

দিয়ে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহ, বায়োফিজিক্স, সলিড স্টেট ফিজিক্স এবং নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স। সাহা বায়োফিজিক্সে কাজ আরম্ভ করান। এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন এল এন দাশগুপ্ত ও তাঁর ছাত্রেরা। পরবর্তী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা (1) আর একটি পার্টিক্ল অ্যাকসিলারেটর — সাইক্লোট্রন ছাড়াও একটি ইলেকট্রন সিলক্রোটন স্থাপনের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। (2) নিউক্লিয়ার ফিজিক্স : আলফা, বিটা ও গামা স্পেকট্রোস্কোপি, নিউক্লিয়ার ইনডাকশন কৌশল ও মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপি, (3) ইলেকট্রনিক্স ও বেতার (ইন্সট্রুমেন্টেশন), (4) নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি, (5) তত্ত্বীয় নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান, (6) নিউট্রন ফিজিক্স ও পোস্ট এম.এস.সি শিক্ষণ।

একটু কাটছাঁট করে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রস্তাবের মধ্যে 50 এম ই ভি ইলেকট্রন সিনক্রোট্রনের দামটা ধরা ছিল। এই অনুযায়ী বিভিন্ন পদ তৈরী হল। অধ্যাপক হিসেবে ডঃ ডি এন কুণ্ডু ও রিডার হিসাবে ডঃ এ পি পাত্র যোগ দিলেন, তবে সাহার ইলেকট্রন সিনক্রোট্রন স্থাপনের ইচ্ছে শেষ অবধি ফলপ্রসূ হয়নি। তা হলেও পরবর্তীকালে সেদিকে কিছু অগ্রগতি যে হয়নি তা নয়। শেষ অবধি কলকাতায় ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন স্থাপিত হয়েছে। এটি ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টারের তৈরী হলেও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ ও বিভিন্ন সরকারী শিল্পসংস্থা। একটি বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী সুইমিং হল রিঅ্যাকটরকে ঘিরে নিউট্রন ফিজিক্স বিভাগ গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা সাহার ছিল, পরমাণু শক্তি দপ্তর তা অনুমোদন করলেন না। সাহার আরেকটি অপূর্ণ স্বপ্ন ছিল একটি স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিকাল ফিজিক্স। বায়োফিজিক্স বিভাগ তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এখন বায়োফিজিক্স এবং মলিকিউলার বায়োলজি এ দুটি সাহা ইনস্টিডটউটের দুটি বড় বিভাগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ চালাবার এই পরিকল্পনা খুবই অভিনব। সেই সঙ্গে পোস্ট এম. এস-সি বিভাগের পরিকল্পনাও এদেশে প্রথম। পুরো ব্যাপারটাকেই একটা নতুন পরীক্ষা বলা চলে। এই ব্যবস্থাটি বেশ ভালই চলছিল। তবে সাম্প্রতিককালে কিছু বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ দেখা গিয়েছিল। সারা দেশ থেকে ভাল ছাত্র ও বিজ্ঞানীদের আকর্ষণ করত এই প্রতিষ্ঠান। পরে অবশ্য সেই স্থান নিয়েছে টাটা ইনস্টিটিউট।

ইতিমধ্যে আরেকটি প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন হয়েছে। এই সংস্থার নাম ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কলেটিভেশন অফ সায়েন্স। কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলে এর নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে। 1952 সালে সাহা এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। এর পুনর্গঠনের কাজে সাহা বহু সময় দিয়েছিলেন। 'শেষ কয়েক বছর' অধ্যায়ে তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার

ফিজিক্সের তিনি ছিলেন আজীবন অবৈতনিক ডিরেক্টর। মৃত্যুর সময় অবধি তিনি এই প্রতিষ্ঠানকেই সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছিলেন । 1952 সালে তিনি কলকাতার উত্তর পশ্চিম নির্বাচন কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্দল সদস্য হিসেবে জয়লাভ করেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রটিতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষণা জোর কদমে সুরু হল। 1955 সালের মধ্যেই দেশে বিদেশে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

অন্যান্য সাংগঠনিক কাজেও তিনি যথারীতি ব্যস্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনি। 1948 সালে এই কমিশন গঠিত হয়। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ছিলেন এর চেয়ারম্যান। তাছাড়া সুরু থেকেই সাহা ছিলেন বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত । 1941 সালে এই বোর্ড গঠিত হয় পরে নাম বদলে হয় কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ । সাহা ছিলেন এর গভর্নিং বডির সদস্য । তাছাড়া এরা অন্য যে সব কমিটি গঠন করেন সবগুলির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন তিনি । এই বোর্ড ও কাউন্সিলের কাজকর্ম ও উন্নতিতে তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট। কলকাতায় গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যাপারেও তাঁর বড় ভূমিকা ছিল । ইণ্ডিয়ান ফিজিকাল সোসাইটির কাজকর্মেও তিনি সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সে প্রকাশিত হয় । এশিয়াটিক সোসাইটির কাজকর্মেও তাঁর আগ্রহ ছিল । এর প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন এখানে কাজকর্মের নতুন উদ্যোগ ও উদ্যম দেখা দেয় । তাঁরই প্ররোচনায় সোসাইটি .শিশির কুমার মিত্রের "আয়নমণ্ডল" ও নীহাররঞ্জন রায়র "বাঙালীর ইতিহাস" প্রকাশ করে । আরও যে সব সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সেগুলি হল ভিক্টোরিয়া মেমারিয়াল (ট্রাস্টি হিসেবে), ইন্দো-সোভিয়েত ফ্রেণ্ডস সোসাইটি (প্রেসিডেন্ট), সিনো-ইণ্ডিয়ান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (ভাইস প্রেসিডেন্ট) ।

1956 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাহার মৃত্যুর পরে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির নাম বদলে করা হয় সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স । তাঁর পরে ডিরেক্টর হন বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরী, 1968 অবধি এঁর কার্যকাল ছিল । এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম এখন অনেক বিস্তৃত হয়েছে, কলকাতার সল্টলেক ও বেলগাছিয়াতেও এঁদের বাড়ী তৈরী হয়েছে।

বিদেশের বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের সঙ্গে সাহার যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁদের অনেকেই সাহা স্মৃতি বক্তৃতা দিতে আসেন । তাঁদের মধ্যে আছেন হ্যারল্ড স্পেন্সার জোনস্ নীলস বোর, এস চন্দ্রশেখর, লরেন্স ব্র্যাগ, এনা জান্‌সি এবং এ আই ওপেরিল । তাঁরা সকলেই এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন । তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা থেকে সাহার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা স্পষ্ট হয়।

ছয়

জাতীয় পরিকল্পনা

মেঘনাদ সাহার মত ব্যক্তির জীবন ও কাজের প্রসঙ্গ সমাজ সচেতনতার প্রসঙ্গ এসে পড়তে বাধ্য । তাঁর সব কাজের মধ্যেই আছে সামাজিক উদ্দেশ্য, কিছু করার আগ্রহ । অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি একা ছিলেন না। একদিকে যেমন ছিলেন সি ভি রামনের মত বিজ্ঞানী, যাদের মতে বিজ্ঞানই তাঁদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, আবার অপর দিকে ছিলেন ভাটনগর ও ভাবার মত লোক, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সমাজ-কল্যাণমূলক। এইসব লোকেরাই ভারতের আধুনিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন। এই ঐতিহ্যকে রূপ দিয়েছে তাঁদের এই বিশিষ্ট মানসিকতা। এর সঙ্গে খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। এই ঘটনাবহুল কাল, এই সময় এমন সব মানুষকে বিকশিত করে তোলার কাজে কতটা ভূমিকা নিয়েছে।

ভাবা অবশ্য জাতীয় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন একটু পরে — তখন বৃটিশদের চলে যাবার তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে। সাহার অধিকাংশ ধারণার জন্ম হয় তিরিশের দশকে — তখন দেশোদ্ধারের চিন্তায় প্রত্যেকেই উদ্বুদ্ধ। সকলেই দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রথম দিকে সাহার কিছু যোগাযোগ ছিল । কিন্তু পরে তিনি ভাবাবেগ সর্বস্ব দেশপ্রেম থেকে আরও গঠনমূলক জাতীয়তার দিকে এগিযে যান। যদি বৃটিশরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত হয়, সেই ভেবে ভারতের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা খসড়া প্রস্তুত করেন তিনি।

ঠিক এই সময়ে তাঁর আগমন না হলে কি তাঁর পক্ষে জাতীয় পরিকল্পনার কাজে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগে করা সম্ভব ছিল ? ইংরাজরা চলে যাচ্ছে । কিছু দেশপ্রেমী নেতাকে সম্বল করে ভারত তার ভাগ্যের মুখোমুখি হতে চলেছে । দেশের অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্পর্কে এই সব নেতাদের খুব স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তবে তাঁরা নতুন ধারণা গ্রহণ করতে পশ্চাদপদ ছিলেন না । নেহরু ও সুভাষচন্দ্র ছিলেন এইরকম খোলামনের লোক । তবে গান্ধীজির একটা বেশ স্পষ্ট জীবনদর্শন ছিল। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে সাহা যদি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অধৈর্য্য ভঙ্গীতে কংগ্রেস নেতাদের পরিকল্পনা বিষয়ে বোঝাতে না পারতেন তাহলে জাতীয় পরিকল্পনার রূপ রেখা কেমন হত বলা যায় না ।

তখন সময় অনুকূল । কোন একরকমের পরিকল্পনা সুরু করতেই হয় । তাঁর বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সাহায্য নিয়ে এ ব্যাপারে সাহা ভালরকম চিন্তা করেছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়াতে কীরকম পরীক্ষা চলছিল তা তিনি দেখে মুগ্ধ হন এবং এদেশেও ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ফল পাওয়া যাবে মনে করলেন। ইতিমধ্যেই তিনি সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার পত্রিকায় নদী-নিয়ন্ত্রণ ও অন্য ধরণের পরিকল্পনা নিয়ে লেখালেখি আরম্ভ করে দিয়েছেন । ইউ পি আকাদেমী অফ সায়েন্সের একটি আলোচনাচক্রে তিনি পণ্ডিত নেহেরুকে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানান । আলোচনা ছিল বিদ্যুত উৎপাদন নিয়ে । এখানে নেহরুর সামনে কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয় । বড় মাপের পরিকল্পনা বিষয়ে সাহা ভাবতে সুরু করেছিলেন । এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটে । ফলে সাহা দ্রুত মনস্থির করে ফেলেন।

ঘটনাটি ছিল এই। একটি দেশলাই কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় ইউ পি-র প্রথম কংগ্রেস সরকারের শিল্পমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার বলেন, "এইভাবে আমরা বৃহৎ শিল্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।" সম্ভবত মন্ত্রী মহাশয় আবেগের আতিশয্যে এই কথা বলে ফেলেন। হয়ত তাঁর আসল বক্তব্য ঠিক এরকম ছিল না, কিন্তু সাহা ব্যাপারটি হেলাফেলা করার মত লোক ছিলেন না । এই সাধারণ মন্তব্যে তিনি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের কথায় ঃ

> এই কথাগুলি আমাকে প্রবল ধাক্কা দিল। কারণ, এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্টই বোঝা গেল যে কংগ্রেসের একজন বড়সারির নেতা, যাঁর উপর এই রাজ্যেব শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার ভার আসলে বৃহৎ শিল্প বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি দেখেছি বেশির ভাগ কংগ্রেস নেতার চিন্তা ঠিক এইরকমই । অথচ এঁরাই ভবিষ্যতে দেশকে চালনা করবেন । তাঁদের হাতে ক্ষমতা এলে এঁদের অবস্থা হবে সেই নাবিকেব মত যে জম্মে কখনও সমুদ্র দেখেনি কিন্তু তাকেই জাহাজ চালাতে হচ্ছে। এই সব চিন্তার পরেই আমি ঠিক করি এই ব্যাপারে ভাল করে মন দেব ।"[36]

গান্ধীজির খাদি ও চরকা নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন সাহা । সুবিধা পেলেই তিনি গান্ধীর ধারণাগুলি নিয়ে বিদ্রূপ করতেন । তাঁর মতে এগুলি অচল, গ্রামে ফিরে যাওয়ার ডাক ভাবালুতা ছাড়া আর কিছু নয় । রুশরা যেভাবে শিল্প পরিকল্পনা করেছেন মার্কিনীরা যেভাবে টেনিসি ভ্যালীতে নদী নিয়ন্ত্রণ করেছে — এইগুলিই ছিল তাঁর মতে অনুসরণের যোগ্য । সোভিয়েত পদ্ধতিটিই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে মনোমত। যেভাবে তারা সর্বপ্রথমে বিজ্ঞান আকাদেমীর উপর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ ন্যস্ত করেছিল সেটি তাঁর মত গোছানো প্রকৃতির লোকের কাছে খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

দেখা গেছে যে সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি যে কোন ক্ষেত্রেই যখন কোন

বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব হয় তখন তিনি সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারেই সময়ের দাবী পালন করার ভূমিকা নেয় । এমনকি তিনি সমকালীন সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও সেই প্রয়োজন মেটাবার ভূমিকা কিন্তু তাঁর থেকেই যায় । সাহা ছিলেন কর্মী পুরুষ, দার্শনিক চিন্তার জাল বোনার চেয়ে কাজে নেমে পড়াই ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। আত্মভোলা বিজ্ঞানীর যে সাধারণ ভাবমূর্তি সাধারণের মনে আছে তিনি ছিলেন একেবারেই তার বিপরীত মেরুর অধিবাসী । অত্যন্ত প্রখর বাস্তববুদ্ধি ছিল তাঁর, তাঁর মন ছিল যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণে পটু । কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণে ও সমাধানে না পৌঁছান অবধি তিনি স্থির থাকতে পারতেন না । সমাধান খুঁজে বার করার পর তাঁর কাজ ছিল অন্যদের সে বিষয়ে বোঝান ।

বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার মূলনীতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে তিনি প্রচুর লিখে গেছেন । দেশের সর্বাত্মক দুর্দশা অন্য অনেকের মত তাঁকেও গভীরভাবে বিচলিত করেছিল । তবে একটা ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্য অনেকের চেয়ে আলাদা । আমাদের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে তাঁর কোন অহেতুক মোহ ছিল না । তাঁর ছিল বিজ্ঞানীর নির্মোহ দৃষ্টি, সেই কারণে তিনি আমাদের অনেক সযত্ন লাঞ্ছিত আদর্শের দুর্বলতা লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন। এই একই কারণ তাঁকে অনেক প্রাচীন আদর্শকে সরাসরি বর্জন করার শক্তিও দিয়েছিল । তিনি বলতেন, ব্যক্তিগত জীবনের সুযোগ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে বিজ্ঞান যা দিয়েছে তা ছিল অনেক ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য । কিন্তু তাঁবা তা দিতে পারন নি । বিজ্ঞান পেরেছে । এই যুক্তি অনুসরণ কবতে গেলে বলতে হয়, তিনি বিজ্ঞানকে ধর্মের বিকল্প হিসেবে দেখেছিলেন । খুবই স্বাভাবিকভাবে তিনি মার্কসের অর্থনীতির দিকে আকৃষ্ট হন যাতে বলা হয়েছে উৎপাদনের অর্থনীতিই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গঠনকে নিযন্ত্রিত করে । 1922 সালেব একটি ঘটনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । তখন তিনি তরুণ, দেশের দারিদ্রে বিচলিত, কিন্তু তখনও সেসব সমাধানের কোন স্পষ্ট রাস্তা তাঁর কাছে ছিল না । সুভাষচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণে তিনি বঙ্গীয় যুব সম্মেলনে বক্তৃতা দেন । সভাপতির ভাষণে তিনি সমস্যার যে চেহারাটা তুলে ধরেন তা খুব একটা প্রীতিকর চিত্র নয় । তিনি বলেন ঃ

> দুই হাজার বছর পূর্বে চীনবাসিগণ তাদের দেশের উত্তরে প্রকাণ্ড দেওয়াল তুলে মনে করেছিল যে তারা বৈদেশিক আক্রমণ হতে চিরকালের জন্য নিরাপদ হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোগল মাঞ্চু প্রভৃতি জাতি তাদের পুনঃপুনঃ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে । আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের সংরক্ষকগণ মনে করেছিলেন যে, আচার, ধর্ম ও কুসংস্কারের একটা চীনা প্রাচীর তুলে ভাবতের নিম্নবর্ণদিগকে চিবকাল পদতলে রাখবেন, কিন্তু তার ফল হল যে হাজার বৎসর ধরে তাঁরা ফুটবলের মত একবার তুর্কী, একবার আফগান, ইংরাজের পদতলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন । আমরা যদি মনে করি যে বর্তমানে সরল অনাড়ম্বর জীবনের

একটা আদর্শ তুলে আমাদের জাতিকে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার স্রোতের প্লাবন হতে রক্ষা করতে পারব তাহলে একটা মস্ত ভুল হবে । এমন এক ভবিষ্যতের কথা কেহ ভাবতে পারে না যখন রেল, স্টীমার, টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস দেশ হতে উঠে যাবে, যখন কয়লা বা লোহার খনি আর মানুষের কাজে লাগবে না। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, এই সমস্ত হতে দূরে না থেকে যাতে এই সমস্ত ব্যাপারে পারদর্শিতা লাভ করতে পারি। দেশের সকল রকম বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকে বিদেশীর কবলমুক্ত করে নিজেদের হস্তগত করতে পারি । ত্যাগ খুবই বড় জিনিস, কিন্তু শক্তি ও কর্ম তার চেয়ে কম বড় জিনিস নহে, আমরা অনেক সময়ে আমাদের অযোগ্যতাকে ত্যাগ বলে প্রচার করি ।

বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান । আমি পূর্বেই বলেছি যে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে । এই দেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্য ভবিষ্যতে যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এ থেকে সাহার দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে বোঝা যায় । প্রকৃতির উপরে মানুষের স্থান এই পশ্চিমী ধারণা তাঁর মনোভাবকে প্রভাবিত করেছিল । পরবর্তীকালে এই মানসিকতা থেকে পরিবেশজনিত অনেক বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছে । তবে মনে রাখতে হবে সময়টা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক এবং স্থান সমস্যাসঙ্কুল ভারতবর্ষ । তাৎক্ষণিক সমাধানের দবকার ছিল তখন । তখন গ্রামের জীবন কেমন ছিল সাহা তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন । ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় আমাদের মাথাপিছু আয়ের হিসেব করে তিনি বলেন,

এই যে গঙ্গার দুধারে পাটের কলের বস্তি ও ইংরেজ মার্চেন্টদের কুঠী ঃ ম্যালেরিয়া এদের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পাবে না, কিন্তু একটু ভেতরেই গ্রামে অর্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় অর্ধমৃত । ইংরাজ কল ওয়ালাদের অর্থ আছে, তারা জঙ্গল কেটে, নর্দমা করে, ম্যালেরিয়া তাড়িয়েছে । বাঙ্গালী অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে উৎসন্নে যাচ্ছে ।

সাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মানুষ নিজেই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই দুই মাধ্যমের সাহায্যে মানুষ কত উন্নতি করতে পারে এবং করেওছে । এর পরের কুড়ি বছর তিনি এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন ।

জাতীয় কংগ্রেস ততদিনে ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে । এইসময়ে কংগ্রেস যে সাহার মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তার মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু । 1938 সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন । সাহা বরাবরই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কলেজ জীবন থেকেই তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল । কংগ্রেস সভাপতি পদ লাভের কথা শুনে সাহা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যান । বাজে কথায়

সময় নষ্ট করা তাঁর স্বভাবে ছিল না । তাই তিনি সুভাষচন্দ্রকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেললেন । কংগ্রেস কিভাবে দেশের দুঃখ মোচন করবে, দেশের অগণিত মানুষকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান দেবার কোন পরিকল্পনা আছে কি ? সুভাষচন্দ্র তখনও এই ব্যাপারে খুব ভাল করে ভেবে দেখেন নি । তিনি বললেন, দেশের স্বাধীনতা এলেই ক্রমে ক্রমে সব সমস্যার সমাধান হবে । কিন্তু সাহা নাছোড়বান্দা । তিনি প্রশ্ন করলেন সমাধানটা হবে কিভাবে ?

সুভাষচন্দ্রের কাছে এর কোন সদুত্তর ছিল না । তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন । তার বাইরে তখন তাঁরা আর দেখতে পান নি । তিনি জানতে চাইলেন। এ বিষয়ে সাহার কোন প্রস্তাব আছে কিনা । সাহা তখন তাঁকে একটি সংবাদপত্রের কাটিং দেখান । ইউ পি-র সেই মন্ত্রীর বক্তৃতার অংশ তাতে ছাপা হয়েছিল। সাহা মন্তব্য করেন এই যদি কংগ্রেস নেতাদের চিন্তাধারার নমুনা হয় । তাঁরা যদি চরকা এবং দেশলাই কারখানাকে শিল্পোন্নয়নের প্রথম ধাপ মনে করেন, তাহলে দেশের ভবিষ্যত খুব আশাপ্রদ হতে পারে না।

সুভাষচন্দ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে তখনই সাহার প্রস্তাবে সম্মত হলেন । সাহার প্রস্তাব ছিল একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন । সে বছর অক্টোবর মাসে দিল্লীতে যে মিটিং হবার কথা ছিল তিনি সাহাকে তাতে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সাহা একদিন দেরীতে পৌঁছে দেখেন ইতিমধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়ে গেছে এবং শ্রী এম বিশ্বেসরাইয়াকে তার চেয়ারম্যান হতে অনুরোধ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সাহার মনঃপূত হল না । কারণ তাঁর মতে কংগ্রেসের একজন বড় দরের সদস্যকে চেয়ারম্যান না করলে পরিকল্পনা কমিটির প্রস্তাবগুলিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হবে না । সুতরাং বিশ্বেসরাইয়া সরে দাঁড়ালেন এবং অনেক অনুরোধ উপরোধের পর নেহরু এই পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন । গান্ধীজিকে এই প্রস্তাবে রাজি করাবার জন্য সাহা শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও অনুরোধ করেন । বোম্বাইয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে টি শাহ্ হলেন সাধারণ সম্পাদক (জেনারেল সেক্রেটারী)।। তিনি এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন । কালবিলম্ব না করে কমিটির কাজ সুরু হয়ে গেল । জ্বালানী ও শক্তি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সাহা । নদী নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সংক্রান্ত সাব কমিটিরও সদস্য হলেন তিনি । তাছাড়া মূল কমিটিরও সদস্য করা হল তাঁকে । 1939 সালের মার্চ মাসে কমিটির শেষ মিটিং বসে দিল্লীতে । তখনকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডঃ পট্টভী সীতারামাইয়ার কাছে 26 খণ্ডের ইনটারিম রিপোর্ট পেশ করা হয় । এই প্ল্যান কার্যকর করার দায়িত্ব জাতীয়সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয় ।

এর ঠিক পরেই নেহরু ও অন্য বড় সারির কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হলেন।

জাতীয় পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের এই হল পরিসমাপ্তি । কিন্তু আহমেদনগর জেলে বন্দী অবস্থায় নেহরু এ বিষয়ে ক্রমাগত চিন্তা করে গেছেন। 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' তে তার প্রমাণ আছে । বিরাট আকারে শিল্পোন্নয়নের চিন্তা তাঁর মাথায় ছিল । কিভাবে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি কাজ করেছিল, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিরকম ছিল, বৃহৎ পুঁজিপতিরা কি চেয়েছিলেন এবং কিভাবে তাঁদের সঙ্গে সমঝতায় আসা হয় এ সবই তিনি জেলে বসে লিখে গেছেন ঃ

> ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উৎসাহী প্রবক্তরাও স্বীকার করতে বাধ্য যে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন আছে । এ ছাড়া অন্য উপায় নেই । তাঁরা চান একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৃহৎ শিল্পকে সীমাবদ্ধ রাখতে । তাহলে উপর উপর দেখতে গেলে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে দুই ধরণের উৎপাদন ও অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন । আজকের দিনে শিল্পে বিশেষ অগ্রগতি এবং জ্বালানী সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ছাড়া কোন দেশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না – আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যাপারটা মেনে নিলেও । আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া দারিদ্র দূর বা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কোনমতেই সম্ভব নয় । শিল্পে অনুন্নত দেশ বিশ্বেব শক্তিসাম্যে বিচ্যুতি ঘটাবে। তাদের উপস্থিতি কেবল উন্নত দেশগুলির আগ্রাসী প্রবণতাকে উসকে দেবে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেও তা হবে নামে মাত্র – অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে অন্য দেশের হাতে । ফলে ক্রমে ক্রমে তাদের নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত ক্ষুদ্র শিল্পের উপরেও তার প্রভাব পড়বে । সুতরাং দেখাই যাচ্ছে, কেবল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর নির্ভব কবে কোন দেশ শেষ অবধি সফল হতে পাববে না । এতে না হবে দেশেব সমস্যা সমাধান, না হবে স্বাধীনতা বক্ষা । বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে সাম্রাজ্যবাদীদের ধামাধরা হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপাযে তার অস্তিত্ব বক্ষা কবা সম্ভব হবে না ।
>
> আমি ট্র্যাকটব এবং ভারী যন্ত্রপাতির পক্ষপাতী । আমার স্থিব বিশ্বাস জমিব উপর চাপ কমাতে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে এবং জীবনযাত্রায় মানের উন্নতি করতে দ্রুত শিল্পায়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই । প্রতিরক্ষা এবং অন্য বহু ক্ষেত্রেও শিল্পায়ন জরুরী । তবে সঙ্গে আমি এটাও বিশ্বাস করি যে নিখুঁত পরিকল্পনা ছাড়া শিল্পায়নের পূর্ণ সুযোগ অথবা তার বিপদ এড়ানো সম্ভব নয় । বিশেষ করে চীন ও ভারতের মত দেশে এই ধরণের পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন । কারণ এই দুই দেশেব নিজস্ব ঐতিহ্য আছে, অথচ তাদের বিকাশের গতি থমকে গেছে ।

নেহরুর চিন্তাধারার গতি প্রকৃতি থেকে অনুমান করতে অসুবিধে নেই, তিনি মানসিকতার দিক দিয়ে সাহার খুব কাছে ছিলেন । এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্ব দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে একইরকম কল্পনা করেন কিন্তু পরিস্থিতি তাঁদের দূরে সরিয়ে দেয়।

পরে স্বাধীন ভারতে যখন শেষ অবধি প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হল, সেখানে সাহার কোন স্থান ছিল না ।

সম্ভবত এর একটা কারণ প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসেরই এক শ্রেণীর লোকের প্রবল বিরোধিতা । এই বিরোধীশক্তি এত প্রবল ছিল যে 1950 সালের আগে নেহরুর পক্ষেও কোন কার্যকর পন্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি ।

তিনবছর পরে 1953 সালে প্ল্যানিং কমিশন তাদের শিল্পনীতির খসড়া পেশ করে। প্রথম খসড়ার চেয়ে এটি ছিল অনেক দিক দিয়ে আলাদা। কোন সামাজিক তত্ত্বের চিহ্নও ছিল না, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবার কোন চেষ্টা ছিল না । এই পরিকল্পনায় সুযোগভোগী সম্প্রদায়ের স্বার্থ সবদিক দিয়ে রক্ষা করা হয়েছিল । ততদিনে সাহা লোকসবায় নির্বাচিত হয়েছেন । তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁকে রাজনীতিতে আসার জন্য সমলোচনা করেছেন । এমনকি সংসদে তাঁকে ফিজিক্স ল্যাবরেটরীতে ফিরে যেতেও বলেছেন কেউ কেউ । কিন্তু তাঁর লোকসভায় পৌঁছোন একটি অমোঘ পরিণতি । তাঁর কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় কেন তিনি নিজের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য বিরোধীর ভূমিকা বেছে নেন । তাঁর দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কংগ্রেসের তরফ থেকে নির্বাচনে দাঁড়াবার প্রস্তাবও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন ।

শক্তিবৃদ্ধিব লোভে তিনি লোকসভায় যান নি। যে সমাজ সচেতনতা তাঁকে প্রতিষ্ঠান তৈরী, ক্যালেণ্ডার সংশোধন ও নদী নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বিষয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে সেই একই চিন্তা তাঁকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে । যখনই তিনি প্ল্যানিং কমিশনের সমালোচনা করেছেন তার সঙ্গে উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ উপস্থিত করেছেন । এইসব বক্তৃতাগুলি "রিথিংকিং আওয়ার ফিউচার" (ভবিষ্যত ভাবনা) নামে ছাপা হয়েছে । তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন ঃ তিনি জাতীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে শুধু নামটি না রেখে তা নিয়ে সত্যিকার চিন্তা করেন কারণ তা কাশ্মীর বা কোরিয়ার চেয়ে ঢের বেশি জরুরী ।[40]

সাহার লোকসভায় সদস্যকাল ছিল সংক্ষিপ্ত । কিন্তু এই ভূমিকা তাঁর জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থাকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

সাত

লোকসভায়

ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে চালিত হলে হয়ত সাহা লোকসভায় না গিয়েও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারতেন । কিন্তু তিনি যা চেয়েছিলেন তা হয় নি, তিনি দেখলেন নদী প্রকল্পগুলি ঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে না । পরিকল্পনাতেও স্পষ্ট ধারণার অভাব দেখা যাচ্ছিল । এই অবস্থায় কেবল 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকায় জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লিখে প্রতিবাদ জানান শেষ হয়ে যাবে, এমনটা মনে করার মতো চরিত্রের লোক সাহা ছিলেন না । সকলের কানে তাঁর আপত্তি তুলে ধরার একটাই পথ খোলা ছিল – তা হল লোকসভা থেকে । তবেই জনসাধারণ বুঝতে পারবে এবং সরকার ভুল সংশোধনে তৎপর হবে । গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য বিরোধী দল সব সময়েই দরকার । তখন বিরোধী দলে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসুর মত প্রবল ব্যক্তিত্ব । তিনিই প্রথম প্রস্তাবটি দেন । সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন । গণ পরিষদের নির্বাচনে তিনি সাহাকে দাঁড়াবার পরামর্শ দিলেন । ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল – প্রয়োজন ছিল প্রাথমিক প্ররোচনার । সেটাই দিলেন শরৎচন্দ্র। একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে মনস্থির করা কঠিন, তবে সাহা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। প্রতিপক্ষ প্রবল হলে তিনি তাদের সামনে পিছু হঠার পাত্র ছিলেন না ।

কংগ্রেস অবশ্য তাঁকে তাদের দলেব পক্ষ থেকে মনোনয়ন দিতে রাজি হয় নি। খাদি ও চরকার কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি । এমন সেকেলে ভাবধারা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করার সুযোগ পেলে তিনি কখনও ছাড়তেন না । কংগ্রেসের কার্যকলাপের মূল সূত্রগুলির তিনি বিরোধী – এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হল । এমন কি তাঁকে বলা হল, এতদিন যা বলেছেন তা প্রত্যাহার করে নিন। সাহা স্বভাবতই তাতে সম্মত হন নি । খুব স্পষ্ট ভাষায় তিনি উত্তর দেন, আদিম প্রযুক্তি আঁকড়ে থাকা খুবই অবৈজ্ঞানিক এবং অনগ্রসর চিন্তাধারার পরিচায়ক । তিনি কংগ্রেসের মনোনয়ন চান না কারণ তাদের শ্লোগানের চেয়ে বিজ্ঞান তাঁর কাছে অনেক বেশি প্রিয়।

1952 সালের নির্বাচনের সময় অবশ্য শরৎচন্দ্র বসু জীবিত ছিলেন না । তবে তাঁর স্ত্রী বিভাবতী বসু সাহাকে উৎসাহ দেন । একবার মনস্থির করে ফেলার পর সাহাকে আর সে পথ থেকে টলানো সম্ভব ছিল না । কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেন । শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের

অনেকে প্রচার কার্যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন । অভাবনীয় দিক থেকে সহযোগিতা আসতে লাগল । তাঁর বিপক্ষে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন একজন নামকরা ব্যবসায়ী । নির্বাচন হয়ে যাবার পর তিনি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সাহার কাছে আসেন। বিরাট ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন সাহা । 1952 থেকে 1956 সালে মৃত্যুর সময় অবধি তিনি সক্রিয়ভাবে লোকসভার কাজে অংশ নিয়েছেন । যদিও মতবাদের দিক দিয়ে তিনি কিছুটা বামপন্থী ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও কোন বাম রাজনৈতিক দলে যোগ দেন নি ।

সম্ভবত ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ঐ বছরই রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়া হয় । তবে স্বভাবের দিক দিয়ে বসু ছিলেন আর এক মেরুর বাসিন্দা । তিনি রাজ্যসভায় মোটামুটি নীরবই ছিলেন ।

লোকসভায় বহু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন সাহা এবং অনেক জরুরী বিষয়ে বিতর্কের সূচনা করেছেন । সরাসরিভাবে তিনি সরকারী ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন। তাঁর অভিযোগগুলি যথেষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত – কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হত । যখন ঠিকমত উত্তর জোগাত না তখন তাঁরা সাহাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতেন । তিনি নিজের ক্ষেত্র ছেড়ে কেন বাজনীতিতে মাথা গলাতে এসেছেন এই নিয়ে কটাক্ষ করা হত । একটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ

কে ডি মালব্য ঃ ইতিমধ্যে একটি পারমানবিক চুল্লী গ্রুপ গঠিত হয়েছে – আশাকরি আমাদেব বন্ধু মন্ত্রকের কাগজপত্র থেকে সে বিষয়ে অবহিত আছেন ।

মেঘনাদ সাহা ঃ এটা 1948 সালেই করা উচিত ছিল । পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রথম বিবৃতি দেখুন। তাতে বলা ছিল পাঁচ-বছরের মধ্যে আমাদের একটি পরমাণু চুল্লী তৈরী হবে । সেটা ছিল 1948 সাল । পাঁচ বছর পরে কেন এই গ্রুপ গঠিত হচ্ছে ?

কে ডি মালব্য ঃ কমিশন যা করেছেন আমি কেবল সেটাই আপনাদের জানালাম। কাজটা দ্রুত হল কিনা তার বিচার ডঃ সাহা করবেন । দেরীর কারণ আমাব জানা আছে । সেজন্যই আমি বলেছিলাম, ডঃ সাহার মত বিজ্ঞানীরা আর একটু তৎপর হলে সম্ভবত আমরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করতে চলেছি তার পরিমাণ বাড়ত । ... ডঃ সাহা আমার অধ্যাপক। এছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই । আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম । আমি জানি তিনি খুব জেদী প্রকৃতির। যখন তিনি জেদী নন তখন তিনি অনেক কাজে আসেন, তবে জেদ করলে তার বিপরীতটাই ঘটে । তাঁর রাজনীতিতে আসা এইরকম একটি ঘটনা।

1954 সালের 10 মে লোকসভায় শান্তির কাজে পরমাণু ব্যবহার নিয়ে যে বিতর্ক হয় তার সূত্রপাত করেন সাহা। এই বিষয়টি ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বিভাজনক্ষম উপাদানের যে আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার খোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সাহা তাঁর বক্তৃতায় তার উল্লেখ করেন। আইসেনহাওয়ারের কথাগুলি কিঞ্চিৎ রহস্যময় ছিল। বিজ্ঞানীর মন নিয়ে সাহা তাঁর ভেতরের তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারেন নি। তিনি প্রস্তাবটি সরলচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। তবে রাজনীতিবিদদের কাছে এর আসল উদ্দেশ্য গোপন ছিল না। সেইকথা বলেন হীরেন মুখার্জি। সাহার বক্তব্যের পর তিনি বলেন আইসেনহাওয়ার যা প্রস্তাব দিয়েছেন তার মর্মার্থ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের মজুদ উপাদানের কিছুটা এই আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারকে দেবে। "কথাটা উপর উপর শুনতে ভাল। কিন্তু এর পরিণতি কি ? এর মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ইচ্ছামত ব্যবহার করার জন্য পরমাণু ও অন্য বিধ্বংসী মারণাস্ত্র থেকেই যাচ্ছে।"[42]

ভারতে পরমাণু শক্তির বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন সাহা। এই কাজে অন্য দেশে কিভাবে টাকা বরাদ্দ করা হয় তার সমস্ত বিবরণ তিনি উপস্থিত করেন। পরমাণুশক্তি বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে সরকারী স্তরেও যে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল তার প্রমাণ — পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন। তবে যেভাবে কাজকর্ম চলছিল তাতে সাহা খুব খুশি ছিলেন না। কারণ অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্টে "আমাদের কি করা উচিত তা বলা নেই, বলা আছে কি কি করা উচিত নয়।" 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়[43] তিনি এ বিষয়ে গঠনমূলক বহু প্রবন্ধ লিখলেন। প্রথম দিকে ভাবার সঙ্গে তার মতবিরোধ ছিল। ভাবা ছিলেন নেহরুর আস্থাভাজন। নেহরু সাহার চেয়ে তাঁর কথার মূল্য দিতেন বেশি। ব্যক্তিত্বের সংঘাতের এইরকম আর একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন সাহার সঙ্গে স্যার সি ভি রামনের বিরোধ। এই বিরোধ পরবর্তী প্রজন্মেও সংক্রমিত হয়েছে। ভাবার সঙ্গে সাহার মতের অমিলের কারণ আরও গভীরে। শিল্প উৎপাদক ধনী পরিবারে জন্ম ভাবার, লেখাপড়া বিলাতে। আজীবন তিনি বৃহৎ অর্থ বিনিয়োগের আবহাওয়ায় লালিত পালিত। সাহার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কাজ করার পদ্ধতি ছিল একেবারে অন্যরকম। দেবেন্দ্র মোহন বসু লিখেছেন[44] ঃ

> ভাবাকে পরমাণু শক্তি দপ্তরের সেক্রেটারী এবং পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী। মনে হয় এই ঘটনা সাহার মনে হতাশার সৃষ্টি করে। 1935 সাল থেকে নেহরু ও সাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে এসেছেন। 1938 সালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন নেহরু তার চেয়ারম্যান হন এবং সাহা ছিলেন তার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রীর কিছু কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার ফলে তাঁর সঙ্গে সাহার দূরত্ব বাড়তে

থাকে । সম্ভবত তাঁর রাজনীতিতে আসার অন্যতম কারণ তাই । তবে ঘটনার গতিপ্রকৃতি থেকে বোঝা গেছে ভাবাকে পরমাণু শক্তি উন্নয়নের সমস্ত ভার দিয়ে নেহরু ঠিকই করেছিলেন । পরমাণু শক্তির বিকাশের কাজে ভাবা সর্বাত্মকরণে নিজেকে নিয়োজিত করেন । সাহার আগ্রহ ছিল বহুবিধ এবং বিচিত্র ।

লোকসভার এই বিতর্ক থেকে নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা জানা যায় । নেহরু ছিলেন পরমাণু দপ্তরের দেখাশোনার দায়িত্বে, কাজেই বিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পারমাণবিক উপাদানের সংযুক্ত ভাণ্ডারের কল্পনায় সাহার বিজ্ঞানী মন পুলকিত হয়ে ওঠে – কিভাবে এই ব্যবস্থা থেকে ভারতের উপকার হতে পারে সে বিষয়ে তিনি কিছু প্রস্তাব দেন । নেহরু মার্কিন প্রস্তাবের অসারতা উপলব্ধি করে চমৎকার বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন ঃ

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরা যাক । তাদের অন্য নানারকম জ্বালানী সম্পদ বিপুল পরিমাণে আছে । তাদের পক্ষে পরমাণু শক্তির মত কোন বাড়তি শক্তি উৎস থাকাটা তত জরুরী নয় । থাকলে ক্ষতি নেই । তবে তাদের কাছে এটার তেমন গুরুত্ব নেই। ভারত এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য শক্তিসম্পদে দরিদ্র দেশের পক্ষে কিন্তু পরমাণু শক্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে । আমি এ কথাটা এজন্যে বলছি যে যাদের শক্তি সম্পদ আছে, তারা ইচ্ছে মত পরমাণু শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করলে তাদের কোন ক্ষতি নেই । কিন্তু ভারতের মত দেশের পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ সমূহ ক্ষতি ডেকে আনবে[45]।

কাজেব ধীর গতি এবং গোপনীয়তার জন্য সাহা পরমাণু শক্তি কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেন । এই অ্যাক্ট বাতিল করে অন্যভাবে কমিশন পুনর্গঠিত হোক এই ছিল তাঁর বাসনা। তিনি চেয়েছিলেন কমিশনের ভিত্তি আরও প্রসারিত করতে ।

নেহরু স্বীকার করেন "কাজের গতি ঢিমে তালে চলছে । আরও দ্রুত এবং বড় আকারে কাজ হওয়া উচিত ছিল ।" কমিশন বাতিল করার প্রস্তাবে তিনি বলেন, গঠনমূলক প্রস্তাব তিনি সর্বদাই শুনতে প্রস্তুত এবং প্রয়োজন মত এই অ্যাক্ট সংশোধন করা যেতে পারে ।

সম্প্রতি বলবন্ত ভানেজা ভারতের বিজ্ঞান নীতির উপর লোকসভার প্রভাব পর্যালোচনা করেছেন । প্রথম অংশে তিনি লিখেছেন,[46]

> স্বাধীনতার ঠিক পরেই সরকারী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গঠন ও প্রসারণের দিকে সরকারের ঝোঁক দেখে সাহার মোহভঙ্গ হয় । কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মৌলিক গবেষণার শ্রেষ্ঠ স্থান বিশ্ববিদ্যালয় । ড. হোমী ভাবার অধীনে 1948 সালে তখন পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয় তিনি তারও বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরমাণু বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রস্তুত না করে এইরকম কাজে ঝাঁপ দিলে দেশে পরমাণু বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতি হতে পারে না ।

দীর্ঘ আলোচনার পর ভানেজা এই উপসংহারে আসেন যে, "নেহরুর সিদ্ধান্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ সরকারী পরিচালনায় শেষ অবধি ভাল হয় নি । সম্ভবত সাহার প্রস্তাব কার্যকর করলে তা দেশের স্বার্থের অনুকূল হত ।"

স্বভাবতই সাহার লোকসভার সদস্যকালছিল ঘটনাবহুল । বহুমুখী নদী প্রকল্প, বৃহৎ শিল্পের বিস্তার, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী নীতিগুলির তিনি সমালোচনা করেন । এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি সর্বাত্মক নীতির অভাব দেখেন যার ফলে জনসাধারণের অর্থের অপচয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছিল । বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বঞ্চিত করে নব-গঠিত জাতীয় গবেষণাগারগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা করার ফল ভাল হবে না – তিনি এই আশংকা প্রকাশ করেন । ডঃ ভাটনগরের কথা উদ্ধৃত করে তিনি সভাকে জানান[47]ঃ

> ডাঃ ভাটনগর মনে করেন, যতক্ষণ না বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম নতুনভাবে বিকশিত করার জন্য উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ এই জাতীয় গবেষণাগারগুলি ভাল ফল দেখাতে পারবে না । আমি দুই প্রজন্মের ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে আসছি । আমাদের ছেলেরা তাদের উৎসাহ ও উদ্যোগে কারো চেয়ে খাটো নয় । ভাল বীজ আছে। কিন্তু তাদের জন্য কেমন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে ? এই ক্ষেত্র মরুভূমি সদৃশ । আমরা এদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা দিই । তারা কাজ করতেই চায় । কিন্তু আমাদের ওয়ার্কশপ, লাইব্রেরী ও গবেষণাগারগুলির হতদরিদ্র ও সেকেলে অবস্থা, কাজেই ছাত্রদের আমরা কিভাবে সাহায্য কবব ? আপনারা যে সব জাতীয় গবেষণাগার গড়ে তুলছেন তা আমাদের কোন কাজে আসবে না । আপনারা মন্দির তৈরী করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত ভক্তেবা এসে মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে এমন ব্যবস্থা করেন নি ।

নদী প্রকল্পগুলি নিয়ে সাহা বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন । বন্যার সঙ্গে তাঁব অভিজ্ঞতা প্রায় জীবনব্যাপী । 1913 সালে দামোদরের সর্বগ্রাসী বন্যা তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা। 1923 সালে উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাথে কাজ করেন। তিরিশের দশক থেকেই তিনি এই নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা সুরু করেন। অন্য দেশে নদীর এই বহমান জলের ভয়ংকর শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগান হয়েছে সেই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে অবহিত হন। তাঁর বিজ্ঞানী মন একে জল-চল বিদ্যার একটি সমস্যা রূপে চিহ্নিত করল আর তাঁর মধ্যেকার সমাজ বিজ্ঞানী দেখল শাপে বর। এত নদী, নদীর জলের অবরুদ্ধ শক্তির এইরকম বিরাট ভাণ্ডার তো অনেক দেশেই নেই। চীনে অবশ্য ভারতের মত বিরাট বিরাট নদী আছে, তবে তখনও চীন একটি ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। আমেরিকার আছে কলোরাডো, টেনিসি, মিসিসিপির মত নদী। সাহা দেখলেন, আমাদের দামোদরের সঙ্গে আমেরিকার টেনিসির অনেক মিল। তাঁরই আগ্রহে আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি অথরিটি থেকে নদী

বিশেষজ্ঞ ডাবলিউ এল ভুরডুইকে ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানান। ভুরডুই সাহার 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকায় টেনিসি ভ্যালি অথরিটির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।[৪৮]

1943 সালে আবার এক ভয়াবহ বন্যায় কলকাতা সমস্ত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাহা ও তাঁর ছাত্রেরা এই সময় বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লেখেন। এন কে বসু, কমলেশ রায়, সমর সেন ও আরও অনেকে সেচ, শক্তি উৎপাদন, ভূমিক্ষয় নিবারণ, পলি পড়া প্রভৃতি নদীবিজ্ঞানের বহুবিধ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে তাঁরা কেবল পূর্ব ভারতের নদীগুলির উপরেই জোর দেন। যে সব নদী পলি পড়ে দিক বদল করেছে সেই সব নদীর ইতিহাস নিয়েও মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান কলেজের উত্তর দিকের বারান্দায় সাহা দামোদর নদীর উপত্যকার একটি ছোট মডেলও প্রস্তুত করেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর ছাত্র কমলেশ রায়।

অবশেষে তাঁদের প্রচেষ্টায় ফল ফলান। বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বে দামোদর বন্যা অনুসন্ধান কমিটি তৈরী হল। তার সদস্য ছিলেন সাহা ও নামকরা কয়েকজন ইঞ্জিনিয়র। তাঁরা একটি বহুমুখী নদী প্রকল্প রচনা করার প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর দামোদর ভ্যালি অ্যাক্ট পাশ হল। ইতিমধ্যেই সরকারী পর্যায়ে মিঃ ভুরডুই-এর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কিছু খসড়াও রচিত হল। মহানদী (হীরাকুঁদ প্রজেক্ট), শতদ্রু (ভাকরা নাঙ্গাল), সোন (রিহাণ্ড) এবং কুশী নদী নিয়ন্ত্রণের খসড়া করা হল।

সাহা যখন লোকসভার সদস্য হন ততদিনে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কাজ সুরু করে দিয়েছে। এই কাজ পর্যালোচনা করার জন্য লোকসভা কর্তৃক এস্টিমেটস কমিটি গঠন করা হয়, এই রিপোর্টে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পায়। সাহা কাল-বিলম্ব না করে এই সব তথ্য তুলে ধরেন।[৪৯] তিনি বলেন,

> অন্য নদী প্রকল্পগুলি সম্পর্কে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে বোঝা যায় এর কোনটিই ঠিক ভাবে পরিকল্পিত হয় নি। দুঃখের বিষয়, এই সব প্রকল্পের প্রযুক্তিবিদরা কিছু গালভরা স্লোগান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'আমরা পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু বাঁধ বানাব।' স্লোগান হিসেবে চমৎকার হলেও বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে এটা কোন কাজের কথা নয়। হিমালয় পর্বত বয়সে নবীন, এর পাথরগুলি খুব কঠিন নয়। কোটি কোটি টাকা খরচ করার পর দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের পাদদেশে খুব উঁচু বাঁধ তৈরী করা যাবে না। আমার ধারনা এই কারণেই ভাকরা নাঙ্গালে এত টাকা খরচ হচ্ছে।

সাহা আরও বলেন,

> আমরা মনে করি নদী পরিকল্পনায় আমেরিকা যা করেছে সেটাই শেষ কথা, সেটা

ঠিক নয়। সব সময় কেন আমেরিকার উপর নির্ভর করতে হবে সেটা আমার মাথায় আসে না। আমাদের বিশেষজ্ঞদের সোভিয়েত রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেখা হোক তারা সেখানে কি করেছে। পরিশেষে আমি একথা বলব যে আমাদের প্রযুক্তিবিদরা উপযুক্ত হয়ে উঠেছে এবং খুব শীঘ্রই হয়ত আমাদের বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডাকার প্রয়েজন হবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দেখা উচিত, ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে থেকে কেউ এগিয়ে আসছে কিনা, এমন লোক যারা আমেরিকান সুপারভাইজারদের হাত থেকে কাজ নিয়ে নিতে পারে। এই নদী প্রকল্পগুলিকে ঘিরে আমাদের অনেক আশা।

হীরাকুঁদ প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি এর পরিকল্পনার অনেক গলদ দেখান এবং কাজকর্মে বিচ্যুতির উদাহরণও দেন। বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন, "এই সব প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে সাজানো না পর্যন্ত আমাদের আর এক পয়সাও ব্যয় অনুমোদন করা উচিত নয়।"[50]

লোকসভায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেন সাহা। এটি হল পঞ্জিকা সংস্কার। ভারতীয় পঞ্জিকাগুলি সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফল এই ক্যালেণ্ডার রিফর্ম। "স্কুল কলেজে সাহার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্ক। তার পরেই তিনি ভালবাসতেন ইতিহাস" — একথা তাঁর সহপাঠী নিখিলরঞ্জন সেনের কাছ থেকে জানা যায়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চমৎকার সমন্বয় ঘটল এই পঞ্জিকা সংস্কারের কাজে। ভারতে ও অন্য দেশে প্রাচীন কাল থেকে সময় নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তিনি ভাল ভাবে খুঁটিয়ে দেখেন। সৌর বর্ণালীর ব্যাখ্যার সময় যেরকম আনুপূর্বক বিশ্লেষণ করেছিলেন এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। পঞ্জিকা সংশোধন বিষয়ে তিনি প্রচুর লেখেন[51]। এশিয়াটিক সোসাইটিতে শকাব্দ কবে থেকে আরম্ভ এই নিয়ে একটি বক্তৃতাও দেন। এই সব প্রচেষ্টার ফলে 1952 সালে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠিত হল। এই কাজের উদ্যোগ নেন সি. এস. আই. আর. সংস্থা।

যে কোন পঞ্জিকার দরকার হয় দুই ভাবে — ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ও আনুষ্ঠানিক কাজে। আমাদের দেশে শিশুর জন্ম মুহূর্ত, বিবাহ, দলিলের তারিখ দেওয়া এবং ধর্ম অনুষ্ঠানের সঠিক সময় জানার জন্য পঞ্জিকা ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এবং অঙ্কের সঠিক হিসাব যে কোন পঞ্জিকার ভিত্তি হওয়া উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় পঞ্জিকা প্রণেতারা প্রায়ই এই সব মূল নীতি থেকে দূরে সরে এসেছেন।

বছরের স্থায়িত্ব কাল নিয়ে সব চেয়ে মারাত্মক প্রমাদটি ঘটেছে। সূর্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক বছর মানে 365.258756 দিন। প্রকৃত বিষুব বর্ষের চেয়ে তা .01656 দিন বেশি। ভারতীয় পঞ্জিকাকারীরা এই পুরানো হিসেব অনুসরণ করেছেন, ফলে 500 খৃষ্টাব্দের পর থেকে এক বছরে 23.02 দিন বেড়ে গেছে। যে সৌরবর্ষ আরম্ভ হওয়া উচিত মহাবিষুবের পর দিন, 22 মার্চ থেকে তা এখন সুরু হয় 13 অথবা 14 এপ্রিল।

ইউরোপে জুলিয়াস সীজারের আমলে বছরের দৈর্ঘ্য 365.25 দিন বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু 1542 সালে দেখা গেল, 10 দিনের গরমিল হচ্ছে। সুতরাং পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী 15 অক্টোবরকে 5 অক্টোবর বলে ঘোষণা করলেন। তা ছাড়া লীপ ইয়ারের ব্যবস্থাও এখন থেকে চালু হল। ইউরোপের ক্যাথলিকদের কাছে পোপের বাণী অভ্রান্ত। ভারতে সেরকম একজন সর্ববাদীসম্মত ধর্মনেতা না থাকাতে এখানে অনেক রকম পঞ্জিকা চলতেই থাকল।

বছরের দৈর্ঘ্য ছাড়াও ভারতীয় পঞ্জিকাগুলিতে আরও নানা গণ্ডগোল আছে। তিথি এবং নক্ষত্র অনুযায়ী বেশির ভাগ ধর্মীয় উৎসবের সময় ঠিক করা হয়। এই তিথি নিরুপন একান্তভাবেই স্থানীয়। দেশের সব অঞ্চলে একদিনে একই তিথি নাও হতে পারে। মধ্যযুগে দ্রুত যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন এতে তেমন অসুবিধে হত না। প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব পঞ্জিকা ছিল। এই অসঙ্গতির ফলে কোন সমস্যা দেখা দিত না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় পঞ্জিকা একেবারেই অচল। প্রয়োজন হল, সমস্ত দেশে একটিই পঞ্জিকার, অথবা যেগুলি আছে তাদের মধ্যে কোনভাবে সমন্বয় সাধন। এদিকে জনসাধারণের আঞ্চলিক ও ধার্মিক মনোভাবকেও অবজ্ঞা করা যায় না। কাজেই পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির সামনে ছিল খুবই কঠিন সমস্যা। হঠাৎ দেশের সর্বত্র যেসব আলাদা আলাদা পঞ্জিকা প্রচলিত আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে তার রিপোর্ট দেওয়া এবং সরকারের কাছে এগুলির সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব দেওয়া। কাজটি খুব সহজ ছিল না।

আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত 30 টি পঞ্জিকা আছে। নেহরু এই রিপোর্টের ভূমিকায় লেখেন, "আগে আমাদের দেশে রাজনৈতিক ভাগ ছিল, এগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে।" তিনি আরও বলেন, "এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখন আমাদের একটি পঞ্জিকা থাকা উচিত। সমস্ত বিষয়টি করা উচিত বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিতে।"

কথাটা বলা যত সহজ ছিল কাজে ততটা নয়। নেহরু আশা করেন যে আমাদের বিজ্ঞানীরা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবেন। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মেঘনাদ সাহা। অন্য সদস্যরা হলেন এ সি ব্যানার্জী, কে কে দফতরী, জে এস করন্তিকর, গোরখ প্রসাদ, আর ভি বৈদ্য ও এন সি লাহিড়ী। এই কমিটির রিপোর্ট 1956 সালে প্রকাশিত হয়।[52]

সামাজিক পঞ্জিকার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব দেওয়া হয় :

1) **জাতীয় ক্ষেত্রে শকাব্দের ব্যবহার আরম্ভ করা উচিত। 1954 সাল শকাব্দ মতে 1875-76।**
2) **মহাবিষুবের পর দিন বছরের প্রথম দিন বলে ধরা হবে।**
3) **সাধারণ বছরে 365 দিন ও লীপ ইয়ারে 366 দিন থাকবে। শকাব্দের সঙ্গে 78 যোগ**

করার পর সংখ্যাটি যদি চার দিয়ে বিভাজ্য হয় তবে সেটি লীপ ইয়ার। তবে 100 এর গুণিতক হলে কেবল 400 দিয়ে বিভাজ্য হলেই লীপ ইয়ার হবে। নয়ত নয়।

4) চৈত্র হবে বছরের প্রথম মাস। চৈত্র থেকে ভাদ্র পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে 31 দিন ও পরের মাসগুলিতে 30 দিন থাকবে।

1400 বছব আগে যা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তার চেয়ে উৎসবের সময়গুলি 23 দিন সরে গেছে। কারণ, পঞ্জিকা প্রণেতারা অয়ন চলনকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। যদিও একবারে এটি সংশোধন করে দেবার সুযোগ ছিল তবু আমবা এটা রেখেই দিলাম। এটি আর যাতে না বাড়ে সেজন্য এই তফাৎটা হিসেবের মধ্যে ধরা থাকল। সুতরাং ধর্ম অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এখন যা প্রথা তার কোন রদ বদল কবা হল না।

82.5^0 পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও $23^0 11'$ উত্তর অক্ষাংশে মধ্যবাত্রি থেকে দিন আবম্ভ বলে ধরা হবে। তবে ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় সূর্যোদয় থেকে গণনা স্বীকার কবা হচ্ছে।

প্রগতিপন্থী রাজ্যগুলি এই সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়। পঞ্জিকা সংস্কারের বিষয়টি এক হিসেবে খুবই বৈপ্লবিক। কারণ, এরসঙ্গে জনসাধারণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্ম বিশ্বাস জড়িত। সরকারের পক্ষে এটি খুবই সাহসী পদক্ষেপ, তবে সাহার মত প্রবল মত সম্পন্ন একজন এই নিয়ে তাগাদা না দিলে হয়ত এ কাজ হত না। অনেক বেশি আধুনিক সমাজে এই জাতীয় কাজে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডারে নানা রকম অসঙ্গতি আছে । কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ব পঞ্জিকার প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় । এই প্রস্তাবটিও সাহার ছিল।

প্রাযই বলা হয়, আমাদের দেশেব বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক স্তবে বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে যতটা একাত্ম বোধ করেন ততটা নিজের দেশের সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখেব জন্য করেন না। মেঘনাদ সাহা ঠিক এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ছিলেন না। তিনি জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন। জীবনে কোন ব্যাপারে তিনি ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেন নি। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রাদ্ধ করেননি। কারণ,তাঁর মতে এই অনুষ্ঠানের কোন অর্থ নেই। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পঞ্জিকা সংস্কারকে তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি বলে ধরা যায়। সর্বান্তঃকরণে তিনি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং চাইতেন সমাজের সব স্তরে যুক্তিভিত্তিক চিন্তার প্রসার হোক ।

আট

শেষ কয়েক বছর

অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাহা একাই সম্পূর্ণ নিজের চিষ্টায় গড়ে তোলেন ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। নতুন কিছু গড়ে তুলতে গেলে বাধা আসে ঠিকই, কিন্তু পুরানো কোন প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তুলতে গেলে যে বিরোধিতা আসে তার কাছে প্রথমটি কিছুই নয়। সাহা এই দ্বিতীয় রকম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেন একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান — ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্সেকে আধুনিকভাবে পরিবর্তন করতে গিয়ে।

আগে যখন অ্যাসোসিয়েশন ছিল বৌবাজার স্ট্রিটে, তখন সাহা সেখানে বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বক্তৃতা শুনতে আসতেন। 1926 সালে তিনি এর আজীবন সদস্য হন যদিও তাঁর সক্রিয় কাজকর্ম সুরু হতে তখনও দেরী ছিল।

প্রথম দিকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কেবল বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সঙ্গে কিছু হাতে কলমে করে দেখবার ব্যবস্থা ছিল। তারপর 1907 সালে রামনের আবির্ভাব হল। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানে সত্যিকার গবেষণা বলতে যা বোঝায় তাই সুরু হল। রামন প্রথমে শব্দবিজ্ঞান ও পরে আলোকবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেন। আলোক বিচ্ছুরণের উপর তাঁর গবেষণাই তাঁকে পরে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। পরবর্তীকালে তাঁর কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, তাতে যুক্ত হয় এক্স-রে এবং চুম্বকবিদ্যা। অনেকদিন অবধি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামটির সঙ্গে রামন ও তাঁর ছাত্রেরা সংযুক্ত ছিলেন। রামন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান। 1933 সালে, যখন তিনি বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, তখন অ্যাসোসিয়েশন মহেন্দ্রলাল সরকারের নামে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হল। কলকাতার স্বনামধন্য নাগরিক রাজা বিহারীলাল মিত্রের দান থেকে এই পদ সৃষ্টি হয়। এই পদে যিনি থাকবেন ওয়ার্কশপ, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর উপর তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে। নোবেল পুরস্কার জয়ী কাজে রামনের সহকর্মী ডঃ কে এস কৃষ্ণন এই পদে নিযুক্ত হন। তিনি তার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার ছিলেন।

1919 থেকে 1933 অবধি রামন ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী। 1934 সালে তিনি এই কমিটির প্রেসিডেন্ট হন। এই সময় তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানে

অনেকগুলি পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। এর ফলে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ট্রাস্টিদের অনেকে এর বিরূপ সমালোচনা করেন। তার মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। ম্যানেজিং কমিটিকে সরাবার কাজে তিনিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সদস্য হবার সর্ত নিয়ে ছিল এঁদের প্রধান আপত্তি। আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকা ও সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণও ছিল এঁদের আপত্তির কারণ। স্যার নীলরতন সরকারকে প্রেসিডেন্ট এবং অধ্যাপক জে এন মুখার্জিকে সেক্রেটারী করে নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হল। এই সময় অ্যাসোসিয়েশনের কাজ কর্মে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য শ্যামাপ্রসাদ সাহাকে অনুরোধ করেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণন কাজ করে যেতে লাগলেন। এখানে তিনি বিষমসারক বস্তুদের চৌম্বক প্রবণতা পরিমাপের নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর ছাত্ররা গবেষণা করেছিলেন উপচুম্বকীয় দ্বি-প্রতিসরণ নিয়ে, যার থেকে ক্রিস্টলীয় ক্ষেত্রের স্বরূপ ধরা পড়ে। এই গবেষণায় তিনি সফল হন এবং 1941 সালে ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি হন। 1942 সালে তিনি অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে চলে যান। সাহা এলাহাবাদ ছেড়ে আসার পর থেকে এই পদটি শূন্যই ছিল। 1939 সালের মহাযুদ্ধের পরে কাজকর্মের গতি ধীর হয়ে যায়। এই কারণেই কৃষ্ণন কলকাতা ছাড়েন। আরও কয়েক বছর তিনি থেকে গেলে হয়ত এই প্রতিষ্ঠানে আর একটি নোবেল পুরস্কার আসতে পারত কারণ, তিনি সেমি কণ্ডাকটর আবিস্কারের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন ডঃ কেদারেশ্বর ব্যানার্জী। 1943 সালে অস্থায়ী রীডার হিসেবে যোগ দেন ডঃ সুকুমার চন্দ্র সরকার। কেদারেশ্বর বাবুর পরে তিনি মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক পদ পান।

সাহা ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। 1942 সালে তিনি এর সেক্রেটারী এবং 1946 সালে প্রেসিডেন্ট হন। বৌবাজার স্ট্রিটের বাড়ীটি ততদিনে জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে। উঠোনে পায়রার ঝাঁক নোংরা করে। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি গত শতাব্দীর পরে আর বদলান হয় নি। রামন ও কৃষ্ণনের সুনাম এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ঠিক, কিন্তু এই বাড়ী এবং এই সেকেলে কর্মপদ্ধতি দিয়ে আর কিছু করা সম্ভব নয়। ঐ অপরিসর জায়গাতে আর সম্প্রসারণ করাও অসম্ভব। সাহা ও তাঁর সহকর্মীরা এই প্রতিষ্ঠানর কর্মক্ষেত্র বাড়িয়ে তোলার এক বিরাট খসড়া প্রস্তুত করলেন। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, মলিকিউলার গঠন গবেষণার জন্য একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা হোক যেখানে পদার্থবিদ ও রাসায়নবিদরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন। এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সম্পদ রামন প্রভাব। এক্স-রে এবং চুম্বকবিদ্যার বিশেষ প্রয়োগ করার সুবিধাও তাহলে পাওয়া যাবে। সেইসঙ্গে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা ও ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে মৌল গবেষণাও চলবে। ঠিক হল জেনারেল ফিজিক্স, এক্স-রে ও

ম্যাগনেটিজম, অপটিকস, থিওরোটিক্যাল ফিজিক্স, অর্গ্যানিক ও ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির আলাদা আলাদা বিভাগ থাকবে। বিভাগের প্রধান হবেন একজন অধ্যাপক অথবা রীডার। তাছাড়া অন্য সহকর্মী ও যন্ত্রপাতিও থাকবে। এখন প্রশ্ন হল, এই কাজের জন্য অর্থ ও জমি সংগ্রহ কিভাবে কোথা থেকে হবে। কাজটি কঠিন, তবে সুখের বিষয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাওয়া গেল। চার হেক্টরের জমি পাওয়া গেল যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে। 360 বর্গ মিটার জমির উপর নতুন বাড়ী তৈরী হল। 1951 সালে অ্যাসোসিয়েশন এই বাড়ীতে উঠে এল। ততদিনে সাহার প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হয়েছে, জ্ঞান ঘোষ এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন। 1947 সালে যখন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে তখন অবৈতনিক ডিরেক্টর ছিলেন পালিত অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তখন সাহাকে পুরোপুরি ডিরেক্টর হবার জন্য অনুরোধ করেন কারণ, প্রতিষ্ঠানের নতুন চেহারা সাহারই তেরী। 1953 সাল থেকে সাহার অত্যন্ত কর্মব্যস্ত সময় কেটেছে। তখন তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ডিরেক্টর, ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অবৈতনিক ডিরেক্টর। তাছাড়া লোকসভার সদস্য। তাঁর সারাদিনের রুটিন ছিল এই রকম : সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠা, ব্যায়াম, পড়াশোনা। নটার মধ্যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে পৌঁছে যাওয়া। সেখানে তিনি থাকতেন সাড়ে বারোটা-একটা অবধি। তারপর আসতেন ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্মের সময় ছিল বিকেল পাঁচটার পর। তিনি সোকসভার সদস্য হবার পর ইনস্টিটিউটের গেটে একটি নোটিশ ঝুলতে দেখা যেত : "যাঁরা শিক্ষা ছাড়া অন্য কাজে অধ্যাপক সাহার সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে পাঁচটার পরে আসবেন।"

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করার পর এর এক নতুন চেহারা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ল্যাবরেটরী পরিদর্শনে আসেন 1952 সালে। অধ্যাপক লাইনাস পলিং প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা আসেন নানা দেশ থেকে । সেই সময় প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে জানা যায় 1933 থেকে 1953 সালের মধ্যে জেনারেল ফিজিক্স, এক্স-রে এবং ম্যাগনেটিজমে 95টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 1948-53 সালের মধ্যে অপটিকসে 51টি, 1951-53 সালের মধ্যে থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সে 5টি, 1948-53 সালে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে 43টি, 1948-53 সালে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে 21টি, এবং 1948-53 সালের মধ্যে ইনঅর্গনিক কেমিস্ট্রিতে 5টি। শুধু সংখ্যা নয়, গুণগত মানের কারণে এই সব গবেষণাপত্রগুলি সমস্ত বিশ্বে উচ্চ প্রশংসা পায়।

1953 সালে এই প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। তখন একটি বই প্রকাশিত হয়। তাতে এই সংস্থার সমস্ত কাজকর্মের বিশদ বর্ণনা আছে। শতবর্ষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে আসেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

কাজের চাপ যতই থাকুক, সাহা কিন্তু গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। তাই দেশবিভাগের পর যখন স্রোতের মত শরণার্থী আগমন হতে লাগল তখন তিনি গভীর বেদনা বোধ করেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখের কারণ হয়েছিল। কারণ, শরণার্থীদের মধ্যে তাঁর নিকট আত্মীয়েরাও ছিলেন। যদিও সরকার থেকে এদের জন্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা গেল, প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য কিছুই নয়। লোকে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সাহা এ ব্যাপারেও এগিয়ে এলেন।

পূর্ববঙ্গ শরণার্থী সহায়তা কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি আসামের শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। সরকারের পুর্নবাসন নীতি কিভাবে কার্যকর হচ্ছে সেটা দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শিবিরে বহু লোকের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখেন প্রচুর অর্থ খরচ হলেও আসল গৃহহীনদের কাছে তার সামান্য অংশই পৌঁছুচ্ছে। করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির মধ্যে ধুবুলিয়া কলোনিতে গিয়ে তিনি দেখেন বন্য হাতি ও বাঘ অধ্যুষিত পাহাড়ী এলাকায় এগারশ' পরিবারকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। সেখানে যাবার কোন রাস্তা নেই, রাস্তা করার কোন পরিকল্পনাও নেই। ফলে এগুলি উপত্যকা অঞ্চল থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। কাছাড় জেলায় চা বাগান মালিকরা প্রায় চল্লিশ হাজার হেক্টর কৃষিযোগ্য ভূমি হাত ছাড়া করেনি। তাদের যুক্তি, তারা ভবিষ্যতে এখানে তাদের নিজেদের শ্রমিকদেব থাকার ব্যবস্থা করবে। স্থানীয় জমির মালিকরা এই সুযোগে বেশি টাকায় জমি ভাড়া দিতে লাগল।

সাহার বিশ্বাস ছিল, পুনর্বাসন নীতি সফল না হওয়ার প্রধান কারণ এটি জোড়াতালি দিয়ে করা। হতভাগ্য গৃহহারাদের দেশের সামগ্রিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। লোকসভা সদস্য ত্রিদীব চৌধুরীর সঙ্গে যুক্তভাবে একটি প্রেস বিবৃতিতে উনি পণ্ডিত নেহরুকে অনুরোধ করেন, পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন বিভাগকে সংযুক্ত করে নিজে তার দায়িত্ব নিতে। সাহা বলেন, "স্মরণ করা যেতে পারে যে 1945 সালে পশ্চিম জার্মানীর সামনে এই একই সমস্যা অনেক বড় আকারে দেখা দিয়েছিল। এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে 25 লাখ প্রথম দুবছরের গোলমাল ও অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু বাকিরা 1954 সালের মধ্যে সুন্দরভাবে পুনর্বাসিত হয় — আমাদের একজন সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরকালে তা দেখে এসেছেন। এদের সাফল্যের কারণ, প্রথম থেকেই জার্মানরা সামগ্রিক কর্মসংস্থানের প্রকল্প নিয়েছিল।"

রাজ্য পুনর্গঠন

জীবনের শেষ দিকে সাহা রাজ্য পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

এলাহাবাদে থাকার সময় থেকেই তিনি সংখ্যালঘুদের সমস্যা বিষয়ে ভাবতে শুরু করেন। তার কারণ এই নয় যে হিন্দি ভাষী "যুক্ত প্রদেশে" তিনি বাঙালী ছিলেন। আসল কথা ভারতের মত বহুভাষিক দেশে প্রত্যেক রাজ্যেই ভাষাগত সংখ্যালঘু থাকবেই। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ইউ পিতে খুবই সুখে কাটিয়েছেন। "আগ্রা ও অযোধ্যায় যুক্ত প্রদেশে আমি 15 বছর কাটিয়েছি। তখনও পর্যন্ত ওখানকার বাঙালী বাসিন্দাদের প্রতি কোনরকম বিষম্যমূলক আচরণের কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। হিন্দি ও উর্দূর বদলে বাংলায় শিক্ষা দেবার জন্য বাংলা স্কুল চালাতে দেওয়া হত।" 1939 সালে হিন্দুস্থান স্ট্যানর্ডাডে লিখিত এক প্রবন্ধে তিনি এই উক্তি করেন।

একটি সুসংবদ্ধ দেশ হিসাবে ভারতের অস্তিত্ব তার বৈচিত্রের উপর নির্ভর করে আছে এটাই ছিল তাঁর অভিমত। ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারত অভিন্ন, কিন্তু এর ভাষা বহু। সুইজারল্যাণ্ড ও রাশিয়া ছাড়া তিনি আর কোন দেশে এরকম উদাহরণ দেখেন নি। রাশিয়াতে বহুভাষা সমস্যার সমাধান দেখে সাহা আকৃষ্ট হন। সেখানে ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্য। নিজেদের ভাষা ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলেও কোথাও তিনি সংখ্যালঘুদের স্বার্থহানি করে তা করা হয় নি। সাহার মত ছিল যে, ভারতের উচিত তেমন কোন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা।

লোকসভায় থাকার সময় তিনি সুযোগ পেলেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনেব প্রশ্নটি তুলতেন, মনে করিয়ে দিতেন যে কংগ্রেস এটি করতে দায়বদ্ধ। লোকসভার বক্তৃতায় এবং সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকায় তিনি বাববার কংগ্রেসের সমলোচনা করে দেখিয়েছেন কোন কোন ক্ষেত্র অবহেলিত থেকে গেছে। জামশেদপুর ও তার আশপাশের এলাকা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না হওয়াতে তিনি ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। গ্রীয়ারসনের লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখান, ধলভূম ও অন্য সীমান্তবর্তী জেলায় কোন ভাষাভাষী কিভাবে ছড়িয়ে আছে। তাঁর অভিযোগ ছিল যে পশ্চিমবাংলার উপর ঘোর অবিচার করা হয়েছে এবং কংগ্রেস তার নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।

কাজেই যখন বাংলা বিহার যুক্ত করার প্রস্তাব উঠল সাহা তার প্রবল প্রতিবাদ করলেন। মাতৃভাষা ব্যবহার করা যে কোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, সেই অধিকার হরণ করে নেওয়া গণতন্ত্র বিরোধী। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে খুবই উত্তেজিত ছিলেন তিনি। সম্ভবত তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণও তাই। তাঁর শেষ বার দিল্লী সফরে এই প্রশ্নটি আলোচিত হবার কথা ছিল। খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। তখন রক্তচাপও বেশি ছিল। সম্ভবত দুশ্চিন্তার ফলে তাঁর স্ট্রোক হয়। লোকসভার যাবার পথে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

16 ফেব্রয়ারী, 1956 সেদিন সাহা দিল্লীতে প্ল্যানিং কমিশনের অফিসে ডঃ জ্ঞান ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সীচালককে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তিনি ফাইল

বগলে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে হাঁটতে শুরু করেন। কয়েক পা গিয়েই পড়ে যান তিনি। তাড়াতাড়ি তাঁকে কাছের উইলিংডন হাসপাতালে (বর্তমানের রামমোহন লোহিয়া হাসপাতাল) নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

বিশেষভাবে চার্টার করা প্লেনে তাঁর দেহ কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল। পশ্চিম বঙ্গের তিনজন নামকরা লোকসভা সদস্য ভূপেশ গুপ্ত, রেণু চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ এই প্লেনে গেলেন।

সেদিন সরস্বতী পুজো। কলকাতায় সব পুজো বন্ধ হয়ে গেল। পথঘাট লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার লোক পথে বেরিয়ে এলেন এই বীর সংগ্রামী মানুষটিকে তাঁর উপযুক্ত বিদায় জানাতে।

নয়

ব্যক্তি ও প্রত্যয়

শ্যাওড়াতলী গ্রামের সেই ছোট ছেলেটি কি ভাবে নানা বাধা অতিক্রম করে ঢাকা সহরে এসে পৌঁছল সে কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। বলতে গেলে এখানেই তাঁর প্রাথমিক লড়াইয়ের অবসান। ঢাকায় ছাত্র অবস্থায় বৃত্তির টাকা পেতেন, তা ছাড়া বড় ভাই ও তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেদের সাহায্যে তাঁর চলত। এই সময়ে এই সাহায্যের পরিমাণ সামান্য হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরও এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা পান। অসাধারণ পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। বাধা যত বেশি হত জেদ ততই বেড়ে যেত। জীবনে কিছু করতে গেলে তার সাফল্যের চাবিকাঠি হল পড়াশোনায় ভাল করা। এটা তিনি বুঝেছিলেন। এই বিশ্বাস তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যায় সাফল্য থেকে বৃহত্তর সাফল্যের পথে। আর কোনদিন তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি।

তবে এই পথ খুব কুসুমাস্তীর্ণ ছিল বলা ঠিক হবে না। 1917 সালেও আমরা দেখতে পাই অর্থের অভাবে তিনি আমেরিকান পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারছেন না। তার ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। তাঁর নিজের কথায় ঃ

> বিকিরণ জনিত চাপ পরমাণুর উপর ক্রিয়া করাব ফলে সৌর পরমাণুতে অভিকর্ষের প্রভাব কিভাবে হয় সেই নিয়ে 1917 সালে আমি দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখি। নাম সিলেকটিং রেডিয়েশান প্রেশার।
>
> অ্যাস্ট্রোফিজিকাল জার্নালে এটি প্রকাশের জন্য পাঠাই, কিন্তু সম্পাদকরা জানান এত দীর্ঘ প্রবন্ধের কিছুটা ছাপার খরচ যদি বহন করতে রাজি থাকি তবেই প্রবন্ধটি ছাপতে পারেন। তিন অঙ্কের এই ডলার দেবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না, ইচ্ছে যতই থাক। সামান্য মাহিনায় (বছরে 150 পাউণ্ড) আমার বৃদ্ধ পিতা মাতার খরচ এবং ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ চালাতে হত। অগত্যা আমি পত্রিকার সম্পাদকদের আমার অসামর্থ্যের কথা জানিয়ে চিঠি লিখি। তারপরে কি হয়েছিল জানিনা। প্রবন্ধটি আমার কাছে ফেরতও আসেনি। অনেক বছর পরে, 1936 সালে ইয়র্কস মানমন্দিরে যখন যাই, তখন ডঃ মরগ্যান আমাকে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি দেখান। সেটি তখনো রাখা ছিল। 1919 সালে পত্রিকার 220 সংখ্যায় তার একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয় এবং আমাদের

নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রবন্ধের অনুলিপি প্রকাশের জন্য পাঠাই। এই পত্রিকার প্রচাব অবশ্য খুবই কম ছিল। এত কথা উল্লেখ করার কারণ আমি হয়ত থিওরি অফ সিলেকটিভ রেডিয়েশন প্রেশার অর্থাৎ নির্বাচিত বিকিরণ তাপ তত্ত্বের প্রথম উদগাতা বলে দাবী করতে পাবি। অবশ্য উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতির জন্য আমি এই ধারণাটি নিয়ে আর বেশিদূর এগোনো সমীচিন মনে করিনি। নেচার 107, 844, (1921) সংখ্যায় ই এ মিলনে আমার কোন টীকা পড়ে থাকবেন কারণ এই বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধে তিনি ফুটনোটে আমার অবদানের উল্লেখ করেছেন। মনে হয় তখন সেটি কারও নজরে পড়েনি। তিনি লিখেছিলেন, 'সাহা প্রথমে যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছিলেন এই অনুচ্ছেদে সেটিই বাড়ান হয়েছে।'

প্রথম জীবনে সাহা যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন পরবর্তী জীবনের বাধা তার কাছে কিছুই নয়। বাধা তাঁর জীবনে অনেক এসেছে। যেমন কলকাতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত, এলাহাবাদে ল্যাবরেটরী গড়ে তোলা। সংগঠনের জাতীয় পর্যায়ে আবও নানা সমস্যা। কিন্তু তাঁর আসল লড়াই ছিল বাইরের শক্তির সঙ্গে ততটা নয় যতটা নিজের সঙ্গে। যে পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিবাট ভূমিকা নিয়েছিল সেই পরিবেশকে অতিক্রম করার জন্য প্রতিনিয়ত তিনি প্রয়াস চালিয়েছেন। এই কাজে তাঁর সাফল্য সন্দেহাতীত, তবু কি এক আশ্চর্য উপায়ে কোনমতেই এর প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

শ্যাওড়াতলীর পৈতৃক বাড়ীতে তাঁদের পূজাব ঘর ছিল এবং বাড়ির সকলে আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা অর্চনা ইত্যাদি কবতেন। অথচ আনুষ্ঠানিক ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন সাহা। এই অশ্রদ্ধা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করেছিল বিরাটভাবে। হিন্দু সনাতন পন্থার কিছু তিনি বুঝতেন না। তাছাড়া জাতি সংক্রান্ত ভেদভাবেব জন্য তাঁকে একটা মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়েছিল। তাঁর কর্ম জীবনে অবশ্য জাত বিরোধিতার কোন প্রভাব পড়েনি কিন্তু একটা গভীর ক্ষত হিসেবে সেটা থেকেই যায়। সম্ভবত অনেক সময় তাঁর বিদ্রোহী মনোভাবের উৎস যে এটা তা হয়ত তাঁর নিজেরও জানা ছিল না। এই অদৃশ্য ক্ষতই তাঁকে স্থির থাকতে দিত না — সব সময় ছুটিয়ে বেড়াত।

সাহা ছিলেন কাজ-পাগল লোক, অন্য কোন কাজে তিনি অযথা সময় নষ্ট করতে পছন্দ করতেন না। এদিক থেকে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যায়। সঙ্গীতে সাহার কোন অনুরাগ ছিল না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে দীপালী নাগকে গান গাইতে বলে তিনি অযথা অপ্রস্তুত করেন। সাহারই অপর ছাত্র বাসন্তী দুলাল নাগ চৌধুরীর স্ত্রী দীপালী নাগ তখনই কৃতী ধ্রুপদী গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালী বিয়ে বাড়ীর হৈ হট্টগোল যে এই ধরণের সঙ্গীতের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত সেই চিন্তা সাহার মনের মতো ছিল না। তিনি ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করতে থাকায় শ্রীমতী নাগ গান গাইতে বাধ্য হন।

খেলা নিয়ে লোকে কেন উম্মত্ত হয় সেটাও তিনি বুঝতে পারতেন না। ফলে অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। একবার ছাত্ররা তাঁকে না জানিয়ে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গেছে — খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলা ছিল সেটি। তাদের দেখতে না পেয়ে সাহা ঘটনাটা আন্দাজ করলেন। খেলার মাঠে গ্যালারীতে বসে ছাত্ররা শুনতে পেল মাইক্রোফোনে তাদের নাম ধবে ডাকা হচ্ছে। তারা যেন এই মুহূর্তে ল্যাবরেটরীতে ফিরে যায়। তারপর সাহার কাছে তুমুল বকুনি। "তোমরা যদি নিজেরা খেলতে তাহলে বুঝতাম—কিন্তু শুধু বসে বসে দেখা নেহাতই বুদ্ধিহীনের কাজ।" শবীর পটু রাখার জন্য তিনি নিজে লেকের ধারে পায়চারী করতেন অথবা বেড়াতেন। সেটা সম্ভব না হলে বাড়ীতে ম্যাসাজ করার জন্য লোক আসত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেছিলেন তারা নার্গিশ নামে কাউকে চেনে কিনা। শুনে বলাই বাহুল্য সকলে হতভম্ব। সেই সময় রাশিয়াতে "আওয়ারা" ছবিটি প্রচুর সাফল্য লাভ করেছিল। স্বভাবতই সকলে এই ছবির নায়িকা সম্পর্কে কৌতূহলী ছিল। সাহা এ ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় ফিল্ম জগতের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সংযোগ ছিলেন ছাত্র জ্ঞান মুখার্জি। একবার তাঁর একটি ফিল্মেব মহরত সাহার হাতেই হয়েছিল।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। হয়ত দু সাইজ ছোট কোট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন – এমন দৃশ্য বিবল ছিল না।

আচারে ব্যবহারে তিনি কেতাদুরস্ত না হলে কি হবে অভাবী দুঃস্থ ছাত্র ও আত্মীয় পবিজনদেব জন্য সর্বদাই তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত ছিল। ছোটবেলায় যাদেব কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের উপকার তিনি সাবাজীবন মনে রেখেছিলেন । কত লোককে যে তিনি গোপনে মানি অর্ডার করে টাকা পাঠাতেন তাঁর বাড়ীর লোকেরাও তা জানতেন না। সিমুলিয়া গ্রামের যে ডাক্তার তাঁকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে তিনি নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। বড় ভাইকে তিনি ছাপরার এক চিনির কলে কেশিয়ারের চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন। দেশবিভাগের পর তাঁর বহু আত্মীয়স্বজন পূর্ববঙ্গ থেকে এদিকে চলে আসেন। কলকাতায় তাঁর বাড়ী ছিল তাদের জন্য অবারিত দ্বার। এলাহাবাদেও তাঁর বাড়ীতে কত আত্মীয়, বন্ধু, ছাত্র যে অনেকদিন থেকে গেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই।

সাহার সন্তান সংখ্যা সাত। তিন পুত্র ও চার কন্যা। এদের মধ্যে দুজন ছাড়া সকলেই বিশুদ্ধ বা ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েছিল।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অজিতের জন্ম হয় 1922 সালে। তিনি এলাহাবাদে স্কুল শেষ করেন। ম্যাট্রিকে তিনি তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন। আই এস -সির পরে তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। পিতার মত তিনিও অঙ্ক নিয়ে বি এস-সি পড়েন ও এস এস-সি পড়েন

পদার্থবিজ্ঞানে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ছিল তাঁর বিশেষ বিষয়। বিটা অ্যাকটিভিটি নিয়ে তিনি কাজ করেন। ইরেঁ জোলিও কুরী, ম্যাক্স বর্ণ এবং এলিস তাঁর পরীক্ষক ছিলেন। বিভিন্ন জাতীয় গবেষণাগার থেকে আমন্ত্রণ আসা সত্ত্বেও অজিত সাহা ইনস্টিটিউটেই থেকে গেছেন। এখন তিনি সেখানে সিনিয়র প্রফেসর।

সাহার দ্বিতীয় পুত্র রঞ্জিতের জন্ম হয় 1923 সালে। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর করে বোম্বাই চলে যান। সেখানে টাটা জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

তৃতীয় পুত্র প্রসেনজিতের জন্ম 1933 সালে । পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি জিও-কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট করে এখন কলকাতার সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সহকারী ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত।

সাহার চার কন্যাই উচ্চশিক্ষিতা। সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর সাত সন্তানেব প্রত্যেকেই লেখাপড়ায় ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, যদিও অজিত ছাড়া আর কেউ পিতাব পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে পিতা ও পুত্রের সায়েন্স কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার উদাহরণ আর নেই।

বাড়ীতে গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা লেগেই ছিল। ফলে তাঁব পুত্রকন্যারা সকলেব সঙ্গে মিলেমিশে থাকার মূল্যবান শিক্ষা লাভ করে। আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তাঁদের জীবনযাপন প্রণালী ছিল খুবই সাদাসিধা।

কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য ছেলেমেযেদের দিকে নজর দেবার সময তিনি কমই পেতেন +-এই কাজ খুবই সফলভাবে পবিচালনা কবতেন স্ত্রী রাধারাণী। তিনি এই বিশাল পরিবারেব দেখাশোনা এবং ছেলেমেযেদের শিক্ষাব তদারকি খুবই দায়িত্বের সঙ্গে করতেন । তিনি নিজে খুব বেশি পড়াশোনা করেন নি, যদিও স্কুলে গিয়েছিলেন। 1920 সালে সাহা ইউরোপ যাবার পর রাধারাণী তাঁর শ্বশুরালয়ে ময়মনসিং-এ বাস করতে যান । তখন তিনি বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কলকাতায় ফেরার পর সংসারের চাপে তাঁর নিজের শিক্ষার কথা ভুলে যেতে হয়। তবে স্কুল কলেজে না গেলেও তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতা। তাঁর স্বামীর বহুবিধ আগ্রহের তিনিও অংশীদার ছিলেন।

তাঁর স্নেহ ও যত্নের কথা সাহার প্রত্যেক ছাত্রই মনে রেখেছেন। ছাত্রদের তিনি নিজের সন্তানের মত ভালবাসতেন। এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর ক্রমে ছাত্র ও গবেষক গোষ্ঠী বড় হতে লাগল। রাধারাণীর পক্ষে তখন আর প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চেনা সম্ভব ছিল না। এই নিয়ে তিনি প্রায়ই আফশোষ করতেন। তাঁদের বাড়ীতে নেহরুর মত লোক এসেছেন, তাছাড়া গণ্যমান্য বিদেশী বিজ্ঞানীদেরও ভোজে

নিমন্ত্রণ জানান হত। শ্রীমতী সাহা অতি চমৎকারভাবে অতিথিদের আদর যত্ন করতেন। সাহার মৃত্যুর 25 বছর পরে 1980 সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মত সহধর্মিণী পাওয়া সাহার পক্ষে খুবই ভাগ্যের কথা।

তাঁদের পারিবারিক জীবন ছিল খুবই সুখের। খুব বিশদভাবে না হলেও সাহা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকে নজর রাখতেন, তাঁর নানাবিধ কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও। অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিভাবান ও কৃতী ব্যক্তিরা ক্রমশ কাজের চাপে পরিবার থেকে দূরে সরে যান – তাঁদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র ক্ষীণ হয়ে যায়। কিন্তু সাহা পরিবারে এই জাতীয় কোন ঘটনা ঘটেনি, যদিও পিতার ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড । প্রায়ই পুত্র কন্যাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হত কিন্তু তিনি কখনও মনের মধ্যে রাগ বা আক্রোশ পুষে রাখতেন না। পরদিন সকালে উঠে সম্পূর্ণ নতুন কোন বিষয় নিয়ে উৎসাহ ভরে তাদের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিতেন, যেন কিছুই হয় নি।

ছেলেমেয়েরা যখন কলেজে ঢুকল সাহা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর সামাজিক দর্শন নিয়ে ভাবের আদানপ্রদান করতেন। একবার তিনি বিদেশ থেকে ফিরলেন, সঙ্গে বার্নার্ড শ-এর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী। সমাজ সচেতন নাট্যকার বার্নার্ড শ-এর প্রতি খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি আকৃষ্ট হন। তাঁর তৃতীয় কন্যা তখন সাহিত্যের ছাত্রী। বইগুলি তাকে দিয়ে তিনি বলেন, 'এগুলো পড়ে দেখ তুমিও এরকম সামাজিক সমস্যা নিয়ে লিখতে পার কিনা।' এই অনুরোধ তাঁর কন্যার পক্ষে রাখা আদৌ সম্ভব ছিল কিনা ভেবে দেখার মত সময় বা মানসিকতা তাঁর ছিল না। তবে এই ছোট্ট ঘটনাটি থেকে তাঁর চরিত্রের খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কোন বিষয় নিয়ে চিন্তিত হলে কিছু না করে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। সুখের বিষয়, পরদিনই তিনি বিষযটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন এবং তাঁর কন্যাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তার আপত্তি শুনলে হয়ত পিতা বলে বসতেন – যদি বার্নার্ড শ এরকম নাটক লিখতে পারেন তুমি কেন পারবে না?

বাড়ীতে পরিচারকদের কেউ চাকর বলে উল্লেখ করলে সাহা অসন্তুষ্ট হতেন, বলতেন কেন, এর কি কোন নাম নেই? এই সচেতনতা শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে নয় ছোটখাট ব্যাপারেও লক্ষ করা যেত। কেউ নিজে উদ্যোগী হয়ে ব্যাবসা করতে নামলে তিনি সর্বদাই তাদের সাহায্য করতে তৎপর ছিলেন। কলকাতার এখনকার এক প্রতিষ্ঠিত বেকারীর সূত্রপাত হয় সাহার কাছ থেকে পাওয়া মূলধনের টাকায়। যেদিন তাদের প্রথম রুটিটি সেঁকা হয় তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনেকেই জানতেন না যে পরবর্তীকালে সাহার নির্বাচনের সময় এই বেকারী থেকে কর্মীদের রুটি পেস্ট্রি সরবরাহ করা হয়েছিল । স্বেচ্ছাসেবকরা দাম দিতে গেলে বেকারীর মালিক টাকা নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন আজ তাঁর যে স্বচ্ছলতা তার মূলে যিনি, তাঁর ঋন শোধ করার নয়। তবু এটুকু তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে যেন গ্রহণ করা হয়।

একটু সময় পেলেই তিনি ছেলেমেয়েদের বই পড়ে শোনাতেন । কখনও তাদের বলতেন কিছু পড়ে শোনাতে। তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহা এইভাবে সন্তানদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। পিতার প্রভাবে তারা সকলেই সঙ্কীর্ণ পুঁথিগত বিদ্যার উপরে উঠতে পেরেছেন।

ইতিহাস ও পুরাতত্ব সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা প্রায় কিংবদন্তী হয়ে আছে। পঞ্চাশের দশকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী পি এ এম ডিরাক সস্ত্রীক কলকাতায় আসেন। সাহার এক ছাত্র তাঁদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাতে নিয়ে যান। ডিরাক সেই সময় স্মৃতিচারণের সূত্রে বলেন এথেন্সে সাহার সঙ্গে ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখার অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলেন, সাহার মত পণ্ডিতের সঙ্গে এথেন্সে ভ্রমণ আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

অনুসন্ধিৎসা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা–এই দুটি গুণ সম্ভবত আছে বিজ্ঞানী হিসেবে সাহার সাফল্যের মূলে। প্রথম জীবনে গণিতের চর্চা এদিকে খানিকটা সাহায্য করে থাকতে পারে। কোন বিষয় আদ্যোপান্ত না জেনে তিনি কখনও মন্তব্য প্রকাশ করতেন না। স্পষ্টভাষণের জন্য তিনি অনেক সময় অপ্রিয় হয়েছেন, লোকে তাঁকে ভুল বুঝেছে। ভণ্ডামি তিনি একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। সাধারণভাবে মানুষের মনে আত্মভোলা বিজ্ঞানীর যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে উনি ছিলেন তার মূর্তিমান ব্যতিক্রম। হিন্দু দর্শন ও বেদ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের জন্য তাঁকে কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । সাধারণের মনে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আধুনিক বিজ্ঞানে পারদর্শী হলে তিনি বেদ পুরাণ জানবেন না। সাহা শুধু যে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তাই নয়, একমাত্র তাঁর পক্ষেই দম্ভের সঙ্গে বলা সম্ভব ছিল "বর্তমান লেখক–এই সম্বন্ধে সমস্ত মৌলিক পুস্তকের জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করেন।" এই উদ্ধত আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর সংগ্রামী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

তাঁর লড়াই ছিল কিসের বিরুদ্ধে? এর উৎস তাঁর নিজের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। আয়নীভবন বিষয়ে গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করার পর তিনি একবার ঢাকা গেছেন। একজন উকিল জানতে চান কি বিষয়ে কাজ করে তিনি এত বিখ্যাত হলেন। কম বয়সের উৎসাহে সাহা তাঁকে নক্ষত্রদেহের উপাদান ও নানা প্রসাঙ্গিক তথ্য বোঝাতে বসলেন। কিন্তু শ্রোতা কিছুতেই বিস্মিত হল না। তিনি কেবলই বলেন, 'এ আর নতুন কি, এ সবই তো বেদে আছে।' সাহা বলেন, 'অনুগ্রহ করে বেদের ঠিক কোনখানে নক্ষত্রদেহের আয়নীভবন সম্পর্কে এই তথ্যটি আছে দেখিয়ে দেবেন কি?' ভদ্রলোক অবলীলাক্রমে উত্তর দেন, 'আমি নিজে অবশ্য বেদ পড়িনি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সবই বেদে আছে।'

পরের কুড়ি বছরে সাহা বেদ, উপনিষদ, হিন্দু জ্যোতিষ আদ্যোপান্ত পড়ে

ফেললেন। তিনি দেখলেন, কিছু কিছু প্রাকৃতিক সূত্রের ব্যাপারে নিউটনের গতিসূত্রের মত নিখুঁত সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁছতে পারেন নি। ভাস্কর আশ্চর্য দূরদৃষ্টি দেখিয়ে মাধ্যাকর্ষণের ধারণা উপস্থিত করেছিলেন – কিন্তু দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে গেলে প্রতীচ্যের পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। 1939 সালে সাহা শান্তিনিকেতনে একটি 'নূতন জীবনদর্শন' নামে বক্তৃতা দেবার পর সনাতনপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন।

সাহা তাঁর বক্তৃতায় বলেন,

> প্রাচীন চীনজাতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে কারিগররূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তিনি হাতুড়ি পিটাইয়া ও কুঠার দ্বারা পাহাড় কাটিয়া সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য চীন দেশে খুব বড় বড় কারিগর ও স্থপতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং চৈনিক সভ্যতায় শিল্পীর স্থান অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক উচ্চে। হিন্দুর সৃষ্টিকর্তা একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগৎ, স্থাবর ও জঙ্গম, জীব এবং ধর্মশাস্ত্রাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য যাহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি করে, হিন্দু সমাজে তাহাদিগকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী, কারিগর ও স্থপতির স্থান এই সমাজে অতি নিম্নস্তরে এবং হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোন যোগাযোগ নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, সহস্র বৎসব ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্পে ও দ্রব্যোৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিযা আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।

সাহার এই মন্তব্যে প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁকে আক্রমণ করে পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হয়। সমালোচকরা বলেন, সাহা যে বিষয়ে জানেন না সে বিষয়ে কথা বলে অনুচিত কাজ করেছেন। কেউ কেউ লেখেন, "হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ডক্টর সাহা যদি কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন, শুধু পরের মুখেই ঝাল না খাইতেন তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন যে এ-বিষয়ে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই।" সমালোচনার সূত্রে একজন মন্তব্য করেন – "মেঘনাদ সাহা বা রবীন্দ্রনাথ কেহই কারিগর নহেন, তাই বলিয়া কি একজন নিপূণ তাঁতী বা মুচির স্থান তাঁহাদের উর্ধে হইবে ?"

এর উত্তরে সাহার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয় বসে থাকা অসম্ভব ছিল। তিনি বলেন, কেন হবে না? একজন মূর্খ পুরোহিত যে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা বিবাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক সম্মান তাঁতী বা মুচীর অধিক হইবে কেন? তাঁতী বা মুচী পরিশ্রম দিয়া সমাজের একটা বিশেষ কাজ করে, কিন্তু মূর্খ পুরোহিতকে প্রতারক

ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? বাটা বা লয়েড জর্জের মত মুচী বা মুচীর ছেলে প্রতিভা দেখাইলে সমাজে কেন শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবে না?"

চারটি প্রবন্ধে প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে সাহা তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করেন। এই প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ছিল।

প্রথম জীবনে ঢাকার সেই উকিল ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাদানুবাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তা থেকেই সাহা বুঝতে পারেন তাঁকে কিসের বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই ঘটনাটি তাঁর বন্ধু ও পরিচিতেরা সকলেই জানতেন। তাঁদের কাছে 'সবই বেদে আছে' কথাগুলি অজ্ঞতার নামান্তর হয়ে দেখা দেয়। সাহার ঘনিষ্ট বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বহু লেখায় ঠাট্টার ছলে এই বাক্যটির উল্লেখ আছে।

বাল্যকালের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার জন্যই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক সাহা চিরকাল ধর্ম অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে এসেছেন। তবে তাঁর কথায় কাজে কোন অমিল ছিল না। নিজের পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি আনুষ্ঠানিক শ্রাদ্ধ করেন নি, তবে এলাহাবাদে গরীব দুঃখীদের আহার্য বিতরণ করেন। ব্রাহ্ম বিবাহপদ্ধতি দেখে তিনি খুবই আকৃষ্ট হন কারণ এই পদ্ধতি তাঁর কাছে খুবই সংগঠিত এবং যুক্তিসম্মত মনে হয়েছিল।

সাহা গান্ধীর পরিবর্তে লেনিনকে পছন্দ করতেন। তাঁর জীবনদর্শন ছিল বস্তুতান্ত্রিক – এইসব কারণে অনেকসময় লোকে তাঁকে ভুল বুঝেছে। আসলে লেনিনের দর্শনকে তাঁর মনে হয়েছিল অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধ। লেনিনের মতে কমিউনিজমেব একটি সংজ্ঞা হল সোভিয়েত শক্তির সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির সমাহার। সুতরাং সাহাব আকৃষ্ট হবাব কারণ সহজেই অনুমেয়। উন্নত শিল্পায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করে সোভিযেত বাশিযা কিভাবে অনুন্নত দেশবাসীকে প্রগতির পথ দেখান সাহার কাছে তা ছিল অনুকরণযোগ্য উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রাশিয়াব প্রায় অসম্ভব রূপান্তর দেখে রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসার কথা। সাহার কাছে কর্মই ছিল ঈশ্বর – অবশ্য "ঈশ্বর" এই কথাটি তিনি ব্যবহার করতেন কিনা সন্দেহ।

সাহার চরিত্রে সবচেয়ে গভীব ভাবে প্রভাব ফেলেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায। বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁর ধারণার মূলেও ছিলেন আচার্য রায় – কারণ তাঁর কাছেই প্রথম হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে সাহা নদীর প্রচণ্ড ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখেন। বন্যাত্রাণ কাজ সমাপ্ত হবার পর ল্যাবরেটরীতে ফিরে গিয়েও কিন্তু এই সমস্যা তাঁকে চিন্তিত করেছে। বিজ্ঞানী সাহার কাছে নদীর এই অবরুদ্ধ শক্তি এক নতুন ভাবনার দিক খুলে দিয়েছিল। কী প্রচণ্ড এই শক্তি – তাঁর বিজ্ঞানীমন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তা হিসেবে এতে আচ্ছন্ন ও অভিভূত হয়। ঠিক এইভাবে প্রথম পরমাণু বোমার পরীক্ষামুলক বিস্ফোরণের খবর শুনে তিনি নাকি মন্তব্য করেন –"কি ভয়ানক সুন্দর দৃশ্য হয়েছিল!"

কী করে নদীকে পোষ মানান যায় – এই চিন্তা তাঁকে আলোড়িত করে চলেছিল। বন্যাত্রাণ কার্য করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের শোচনীয় দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ হন। তাঁর প্রকৃতি ভাবপ্রবণ ছিল না। তিনি ছিলেন চিন্তাধারায় বিজ্ঞানী, তাঁর মানসিক গঠন ছিল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, দুঃখ দেখে আকুল হওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল না। কোন সমস্যা দেখলে তিনি তাকে বিশ্লেষণ করে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে না পৌঁছন অবধি স্থির হতে পারতেন না। সামাজিক চেতনা এইভাবে তাঁকে বার বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের বাইরে এনে দিয়েছে।

বাঙালী জীবনের সার্বিক অবক্ষয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে পীড়িত করত। বাঙালীর চাকুরী নীতির তিনি অনেক সমালোচনা করেছেন। তাদের ব্যবসায় অনীহার কারণ লেখাপড়া–এটা ছিল তাঁর অভিমত। এ ব্যাপারে ছাত্র মেঘনাদ তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন না। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতে সব দেশেই উকীল, ডাক্তার, কেরানী, স্কুল মাষ্টার, গভর্ণমেণ্টের চাকুরে তৈরী করে। তার জন্য শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁর মতে, আমাদের স্বাধীন বৃত্তিতে বিমুখতা, যার জন্য দারিদ্র দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে আমদানী করেনি ; এ দেশের আবহাওয়া, এ দেশের ট্রাডিশনের গুণে তা আপনিই এ দেশের মাটিতে বেড়ে উঠেছে। অন্য কারণেও গুরু শিষ্যের মধ্যে মতভেদ ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র যখন গান্ধীজীর চরকা নীতিতে দীক্ষিত হলেন তখন মেঘনাদ তার প্রবল সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তবু তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। নিয়মিত পত্রালাপ হত। আচার্য একটি চিঠিতে লেখেন, "তুমি এলাহাবাদ হইতে ইলেকট্রিক শক পাঠাইতেছ।" অর্থাৎ 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার প্রবন্ধগুলি। এলাহাবাদে গেলে আচার্যদেব সর্বদাই সাহার বাসভবনে উঠতেন। একবার স্টেশনে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে – গুরু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন – সাহা অম্লানবদনে বললেন, তাহলে আপনার জন্য একটা গরুর গাড়ী ডাকতে বলি ? এটা ছিল গান্ধীর যন্ত্রবিরোধী মতের প্রতি কটাক্ষ।

গান্ধীর অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রশিল্প এবং গ্রামকে স্বনির্ভর করে তোলার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সাহার মতামত ছিল এর বিপরীত মেরুতে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্পায়নের দ্বারাই দেশের উন্নতি আসতে পারে – অন্যভাবে নয় । গ্রামে ফিরে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তাতে জমির উপর চাপ বাড়বে, এমনিতেই সেখানকার লোকেদের যথেষ্ট কাজ নেই। শহরের লোক গ্রামে এসে থাকুক তা গ্রামের লোকেরা পছন্দ করবে না। আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত দরিদ্রতম গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। এখানে সোভিয়েতের দৃষ্টান্ত উদাহরণস্বরূপ। বৃহৎ শিল্পই এর একমাত্র পথ। আধুনিক ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষ যে রোমান আমলের চাইতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছে তার কারণ শিল্প বিপ্লব। এর ফলে ভোগ্যপণ্য সকলের কাছে পৌঁছে

গেছে। তাছাড়া আমাদের বিশাল শক্তি-উৎস নদীগুলি থেকে কাজ পেতে গেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নিতেই হবে। গান্ধীর অর্থনীতি এই দিকটা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে সাহা বরাবর জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে গেছেন। অনেক পরে আধুনিক দেশগুলি সচেতন হয়ে দেখছেন যে অন্য জ্বালানী ফুরিয়ে আসছে। সূর্যের মত নদী একটি অফুরন্ত শক্তির উৎস।

সাহা শুধু কথা বলে ক্ষান্ত থাকেন নি, বিদেশের বিভিন্ন নদীপ্রকল্পগুলি সম্পর্কে তথ্য আহরণ করে তাঁর পত্রিকা 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার'এ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ ছাপার ব্যবস্থা করেন। এই কাজে তাঁর ডান হাত ছিলেন সুযোগ্য ছাত্র কমলেশ রায়। ইনি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনে বহুদিন ছিলেন।

বৃহৎ শিল্প ও শিল্পায়নে অনুরাগ সত্ত্বেও সাহা কিন্তু মৌলিক গবেষণায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি স্যার আশুতোষের মতের অনুসারী ছিলেন। তবে কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রে তাঁকে হার স্বীকার করতে হয়। বড় আকারে গবেষণার কাজে সরকারী অনুদান নেওয়া ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে পড়ছিল। আর অনুদানের সঙ্গে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। 1948 সালে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় তিনি বলেন,

> যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র এই দুটি দেশই নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান গবেষণায় বিকেন্দ্রীকরণ স্বীকার করে নিয়েছে। এই দুই দেশেই দু-ধরণের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে। হারওয়েল বা ওকরিজের মত জায়গায় আধা সামরিক গবেষণা চালিত হয়। সেখানে টাকা সরকারী এবং পরিচালনা সামাজিক তত্ত্বধানে। এইসব কেন্দ্রে সামরিক অথবা শিল্পের প্রয়োজনে পরমাণু শক্তির প্রয়োগ নিয়ে কাজ হয়। তাছাড়াও অবশ্য পাইল নির্মাণ, বিভাজনক্ষম আইসোটোপ পৃথকীকরণ প্রভৃতি অন্য সমস্যাও এদের গবেষণার বিষয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত আবহাওয়ার খানিকটা বজায় রাখারও চেষ্টা আছে।
>
> এছাড়া বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলিতে বড় ধরণের পারমানবিক গবেষণা চলছে। এখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা আছেন। বহুদিনের ঐতিহ্য আছে। সেই কারণে এগুলি মৌলিক গবেষণার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। এখানে সরকারী অনুদান এলেও তার সঙ্গে কোন সর্ত আরোপ করা থাকে না। বাইরে থেকে অনুদান গ্রহণ করার স্বাধীনতা এঁদের আছে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের যে কোন দিকে এঁরা ইচ্ছামত অনুসন্ধান করতে পারেন।

সাহা চেয়েছিলেন আমাদের দেশেও এই পদ্ধতিতে গবেষণা করা হোক। এই কারণে তিনি পরমাণু শক্তি কমিশন গঠনের বিপক্ষে মত দেন। এর ফলে শুধু যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়বে তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ভাল লোক চলে যাবেন এবং টাকাও কমে যাবে – এই ছিল তার আশঙ্কা। চিন্তার স্বাধীনতা তাঁর কাছে ছিল

সব থেকে প্রিয়। তাই নেহরু যখন বললেন পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্র হবে গোপনীয় তখন তাঁর পক্ষে বিরোধিতা করা ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

তাঁর জীবনের বিশেষ লক্ষ্য অদম্য আশাবাদ, বাধাকে বাধা বলে গণ্য না করা, এগুলি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে খানিকটা সীমবদ্ধতা দিয়েছিল। অত্যন্ত অসহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। প্রকল্প রূপায়নে দেরী হচ্ছে বলে তিনি লোকসভায় তীব্র সমালোচনা করতেন – এটা বুঝতেন না যে, যে কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছুটা দেরী হয়েই থাকে। ছাত্র এন কে সাহাকে একটি চিঠিতে তিনি যা লেখেন তা থেকে তাঁর জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়, "পরিশ্রম করে যাও – স্বীকৃতি একদিন না একদিন আসতে বাধ্য।" সাহস বা প্রতিভা যাদের ততটা নেই তারা দমে যান কিন্তু যে সব মনস্তাত্ত্বিক কারণে সাহা তার বাল্যকালের বাধাগুলি অতিক্রম করেন সেই মানসিকতাই তাঁকে জীবনের প্রত্যেকটি দুরূহ কাজের মোকাবিলা করার ক্ষমতা দিয়েছিল।

তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রখর। তিনি ছাত্রদের কাছ থেকেও সেই অনুপাতে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ভয় ও ভালবাসার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। খুব সহজেই রেগে যেতেন তিনি, কিন্তু বিনা কারণে নয়। কাজে অবহেলা এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা তাঁর কাছে ঘৃণিত অপরাধ ছিল। তাঁর রাগের ভয়ে ছাত্রেরা কখনও গাফিলতি করতে সাহস পেত না। সব সময়েই ছাত্রদের মঙ্গলচিন্তা করতেন তিনি। তাদের সম্পর্কে তাঁব স্নেহ এত গভীর ছিল যে লোকসভায় কে ডি মালব্যের তীব্র সমালোচনার পরেও তিনি তাকে ইনস্টিটিউটের স্টুডেন্ট হল উদ্বোধন করতে আমন্ত্রণ করেন।

গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক এক সময়ে এদেশের ঐতিহ্য ছিল। এখন এই সম্পর্ক অন্তর্হিত হয়েছে। সম্ভবত সাহাই ছিলেন এই পরম্পরার শেষ পুরুষ। নবম শতাব্দীতে লেখা সংস্কৃত গ্রন্থ রসেন্দ্র চূড়ামণি থেকে তিনি প্রায়ই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করতেন :

অশৈষম বহূবিদুষাং মুখাদপশ্যাম
শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি ।
যৎ কর্ম ব্যঃচয়মগ্রতী গুরুণাং
প্রৌঢ়াণাং তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ ।।
অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সূতেন্দ্র কর্মগুরবে গুরবস্ত এব ।
শিষ্যাস্ত এত বচয়ন্তি গুরোঃ পুরে যে ।
শেষারঃ পুনস্তস্তয়াভিনয়ং ভজন্তে ।।

অর্থাৎ, বহু পণ্ডিতের মুখ থেকে শুনেছি, শাস্ত্রে লেখা অনেক দেখেছি, যা করিনি তা লিখছি না। শিক্ষক প্রৌঢ়দের সামনে যা হাতে করেছি তা নির্ভয়ে লিখছি । যা পড়ার তা যারা করে দেখাতে পারে তারাই প্রকৃত শিক্ষক। প্রকৃত শিষ্যেরা গুরুর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্যেরা অভিনেতা মাত্র।